শ্মশান-বাসিনী।

(উপন্যাস।)

"আহত গোয়েন্দা" প্রণেতা—

শ্রীকালীকিঙ্কর যশ প্রণীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

কলিকাতা—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে,

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

পঞ্চানন প্রেস।

২৫।৩ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন,

কে, এল, শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২১ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্মশান-বাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ে আঘাত পেয়ে করিয়াছি পণ।
প্রাণ যাবে নয় হবে উদ্দেশ্য সাধন ॥

উদ্দেশ্য সাধন।

বর্দ্ধমানের অতি সন্নিকটে মোহনপুর নামে একটি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামের অনতিদূরে সুবিস্তৃত একটি কাননভূমি। সহসা কোন লোক সেই কাননাভ্যন্তরে যাইতে সাহস করে না, যেহেতু ঐ ভীষণ জঙ্গল মধ্যে দস্যুগণের বাসভূমি বলিয়া চির প্রসিদ্ধ।

একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঐ জঙ্গলে একটি রমণী প্রবেশ করিল। ভাদ্র মাস,—শনিবার—অমাবস্যা—রাত্রি প্রায় দুই প্রহর—(অর্থাৎ যে সময়কে মহানিশা বলিয়া থাকে) জগৎ নিস্তব্ধ। আকাশে চন্দ্র নাই,—মহতের অন্তর্দ্ধানে ক্ষুদ্র ব্যক্তির অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই জন্য অন্ধকার ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ধরণী-বক্ষে গা ঢাকিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে তাড়িতালোকে কথঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টি চলিতেছিল জঙ্গল মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না। সেখানে অন্ধকার আর ও নিবিড়। যেন জগতের তাবৎ অন্ধকাররাশি এক স্থানে আসিয়া জমাট

বাঁধিয়াছে। সম্মুখে কি আছে—কোথায় যাইতেছ, রমণী কিছুই বুঝিতেছে না, তত্রাচ কি একটা মনের আবেগে ইতঃস্তত: বিচার না করিয়া যেন নির্ভয় অন্তঃকরণে চলিতেছে। গমনকালীন কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সমূহের শাখাপল্লব সকল রমণীর মুখে চোখে আসিয়া পড়িতেছে, কখনও বা কণ্টকবৃক্ষ সকল বস্ত্রে সংলগ্ন হইয়া গতিরোধ করিতেছে, হস্তের দ্বারা সে সকল দূর করিয়া চলিতেছে। পদ-দলিত শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দে, গাত্র সঙ্ঘর্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ পল্লবের খর খর শব্দে চারিদিক শব্দিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এরূপ শুনিতে পাইল, যেন, অদূরে কয়েকজন মনুষ্য ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতেছে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, "সে মালের বাক্সটা কোথায় ?"

উত্তর। "আমি তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

প্রশ্ন। "তুমি না বলিলে কি অপর কোন লোকে আসিয়া বলিবে ?"

অপর এক ব্যক্তি বলিল, "কাহাকেও বলিতে হইবে না, আমি বলিতেছি—সে বাক্স আদৌ আমাদের অধিকারে আইসে নাই।"

প্রশ্ন। কেন তাহার মানে কি ?

উত্তর। "একটি রমণী তাহা কিছুতেই ছাড়িয়া দিলনা।"

প্রশ্ন। "সে বাক্স পরিত্যাগ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।"

উত্তর। "অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব। জানতো রমণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে প্রচুর নিষেধ আছে, তাহা কি অবগত নও ? দস্যুবৃত্তি করিতেছি বলিয়া কি প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিব !—সতী অঙ্গ কলঙ্কিত করিব।

প্রশ্ন। অঙ্গে হস্তক্ষেপ ভিন্ন কি অন্য কোন উপায় ছিল না?

উত্তর। কিছু না। অস্ত্র দেখাইয়াছি—গৃহে অগ্নি দিয়া পোড়াইয়া মারিব বলিয়া ভয় দেখাইয়াছি আর কি করিব? তাহাদিগের কথা শুনিয়া ঐ বনস্থিতা রমণী একটু ভীত হইল, বুঝিল ইহারাই দস্যু। আর সে দিকে যাইতে তাহার সাহস হইল না। অন্য পথে যাইবার অভিপ্রায়ে রমণী ফিরিতেছে, হঠাৎ পদদেশে লতা জড়াইয়া গতি চঞ্চল হইল, ভূলুণ্ঠিত শুষ্ক পত্রনিচয় বাদ সাধিল, তাহারা শব্দ করিয়া উঠিল, তৎশ্রবণে একজন দস্যু বলিল, "কে?" রমণী উত্তর না দিয়া ভীতান্তঃকরণে স্থিরভাবে দাঁড়াইল। দস্যুগণ পদশব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল এখানে নিশ্চয়ই অন্য কোন লোক আসিয়াছে। ত্রাস্তভাবে অমনি একজন তাহার মুখমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র একটি বংশীর দ্বারায় এক প্রকার অবিরাম শব্দ করিল। শব্দ ঝিল্লির ন্যায় একটানা। সুষুপ্ত রজনী, জীব জন্তু কাহারও তখন সাড়া শব্দ নাই, সেই ঝিঁ ঝিঁ রব গগণ ভেদ করিয়া—শ্রবণেন্দ্রিয় অবশ করিয়া বনস্থল, প্রান্তর, সরসীগর্ভ প্রভৃতি সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে পলক মধ্যে ভীষণ দর্শন প্রায় একশত লোক তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক বনের চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক, যে স্থানে ঐ নবাগতা রমণী অবস্থান করিতেছিল সেই স্থান বেষ্টন করিয়া ফেলিল। চতুরতা করিয়া একজন বলিল, "তুমি যে হও, মনে করিও না, আমরা তোমাকে অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছি না। উত্তর প্রদান না করিলে এখনই অস্ত্রাঘাতে বিখণ্ড করিব।" ইতিপূর্ব্বে রমণীর

সাহস ছিল, কিন্তু তাহাদের শেষোক্ত বাক্যটিতে ভীত হইয়া বলিল, "আমি রমণী।"

প্রশ্ন। "রমণি!" "এত রাত্রে বনের ভিতর রমণী! কখনই না, নিশ্চয়ই তুই কোন রাজানুচর।"

উত্তর। "রমণীর বনে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাহারা রমণীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। রমণী বলিল, "প্রয়োজন আছে, আমাকে কদাচ স্পর্শ করিও না।"

উত্তর। "যদি প্রকৃত সৎস্বভাবা রমণী হও এবং কোনও দুরভিসন্ধি না থাকে তবে বলিতেছি আমাদের দ্বারায় কোনও ভয় নাই, কিন্তু ছদ্মবেশধারী কোনও রাজানুচর বা অন্য কেহ হইলে রক্ষা পাইবে না।" অপর এক ব্যক্তি বলিল, "ও যখন রমণী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তখন রমণী না হইয়া যদি আমাদিগের শত্রু হয় তাহা হইলেও রক্ষা পাইবে, কিন্তু যাবজ্জীবন বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। প্রভুর এরূপ আদেশ আছে।"

রমণী। "তোমাদিগের কথায় আমার ভরসা হইল। সত্যই আমি রমণী। কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছি। রাজা অথবা রাজানুচরের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। তোমরা নিশ্চিন্তে বিচরণ কর, আমার কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন করিও না।"

প্রশ্ন। "তুমি বলিতেছ আমি রমণী, কণ্ঠস্বরেও বুঝিতেছি রমণীই হইবে, কিন্তু এ অনুপযুক্ত সময়ে এই ভয়ঙ্কর স্থানে রমণীর আগমন সম্ভবপর নহে। সত্যই যদি রমণী হও তবে তোমার সাহস বীর অথবা বীরাঙ্গনার ন্যায়। যদি তুমি দস্যুপতির বিরুদ্ধাচারিণী না হও তাহা হইলে এ অত্যধিক সাহসিকতার জন্য দস্যুপতির নিকট বিশেষ পুরস্কৃতা হইবে।"

রমণী। "যদি পুরস্কৃত করা হয় তবে এই আদেশ কর, যেন এ স্থান হইতে আমি নিরাপদে প্রস্থান করিতে পারি।"

দস্যু। "বিনা পরিচয়ে নিরাপদে যাইতে পারিবে না। যদি আমাদিগের নিকটে পরিচয় প্রদানের কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকে, তবে আমাদিগের প্রভুকন্যার নিকটে চল।" রমণী যাইতে স্বীকার করিল। দস্যুগণ তাহাকে মধ্যস্থলে বেষ্টন করিয়া লইয়া চলিল। নানাবিধ বন, জঙ্গল, অপ্রশস্ত পথ সকল অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে একটি আলোক-মালা-ভূষিত সুসজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে উপস্থিত হইল। রমণী দেখিল তাহার সমভিব্যাহারি দস্যুগণ সকলেই এক একজন বিকট ভীম সদৃশ। সকলেরই মস্তকে নানাবর্ণের উষ্ণীষ,—পৃষ্ঠে বিস্তৃত ঢাল,—করে খরধার নিষ্কোষিত তরবার। সে মৃগরাজ পরিবেষ্টিত মৃগীর ন্যায় তাহাদিগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণী চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতেছে, এমন সময় হঠাৎ গৃহের পশ্চাদ্ভাগে অপর একটি দ্বার সজোরে উদ্ঘাটিত হইল। দস্যুগণ সকলে ত্রস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল, রমণীও কারণ, দেখিল, সম্মুখে একটি সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাহার মস্তকে সুবর্ণময় মুকুট—কর্ণে দোদুল্যমান কর্ণভূষণ,—নাসিকায় সুন্দর বেসর—পরিধান নীলাম্বর—কটিদেশ বসনাঞ্চলের দ্বারায় দৃঢ়রূপে কষিত—করে নিষ্কোষিত অসি দীপ্তমান। দস্যুগণ ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। কটিদেশস্থ অসিকোষ সমূহ ভূমিতল স্পর্শ করিয়া একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। উষ্ণীষের কারুকার্য্য সকল দীপ্তি পাইল। পূর্ব্বোক্ত রমণীর চক্ষে হর্ম্মতল দেবমণ্ডলী বলিয়া বোধ হইল। পাঠক! ইনিই দস্যুদিগের প্রভুকন্যা। রমণী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নমস্কার

করিল। দস্যুকন্যা প্রতি নমস্কার করিয়া দস্যুদিগকে বলিল, "কে আসিয়াছিল?" একজন রমণীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এই রমণী।"

দস্যুকন্যার নাম রজনী। রজনী আগত রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল অতি চমৎকার রূপ। যামিনীর অন্তিম সময় দেখিয়া দীপরশ্মি ম্লান হইতে ছিল, রজনী পুনর্ব্বার তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। রমণীর মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বলতর হইল। রমণী গৌরবর্ণা।—কেবল গৌরবর্ণা বলিলেও যেন বর্ণনার একটি অভাব থাকে, গৌরবর্ণেও সচরাচর সেরূপ অপূর্ব্ব রমণীয়তা দেখা যায় না। বিশুদ্ধ কাঞ্চন যদি নয়ন রঞ্জক হয় তবে বলিতে পারা যায় সুন্দরী অবিকল বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণা। দেহায়তন অতিশয় স্থূল বা দীর্ঘ নহে অথচ খর্ব্বাকৃতি বা ক্ষীণ বলিলেও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়াছে। পশ্চাৎ হইতে দেহ প্রতিমাখানি দেখা যায়না। নয়নযুগল শ্রবণায়ত, প্রস্ফুটিত নলিনীর ন্যায় প্রফুল্ল।—কেবল প্রফুল্ল নহে, চাহনিতে একপ্রকার মধুর চপলতা আছে—সে চপলভাব সকল সময়ে দেখা যায় না, কাহারও সহিত কথা কহিলে প্রকাশ পায়। অধর পল্লব আরক্তিম—তাম্বুল রাগ রঞ্জিত। মধ্যদেশ ক্ষীণ—দেহ সতেজ স্ফুর্ত্তিব্যঞ্জক। সুন্দরী সম্পূর্ণ নিরাভরণ নহে, করে হীরক খচিত সুবর্ণ বলয়-সীমন্তে সিন্দুর—প্রকৃতি গম্ভীর। এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করে নাই,—যৌবন শশীর বিমল কৌমুদী ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া গিরি শিখরে আশ্রয় লইয়াছে। রজনী অনেকক্ষণ অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রমণী, একাকিনী তবে বনে আসিয়াছিলে কেন?"

রমণী বলিল, "কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাহাতে আপনাদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। আমাকে ছদ্মবেশী রাজানুচর বোধে আপনার অনুচরগণ ধরিয়া আনিয়াছে। এই সত্যবাক্য বলিলাম, যদি বিশ্বাস করেন তবে আমাকে যাইতে আদেশ করুন্। রাত্রি প্রভাত হইলে আমার এত কষ্ট সমস্ত বিফল হইবে।"

রজনী। "তোমার বাক্যে যদি বিশ্বাস না করি?"

রমণী। "না ক'রেন, উপায় নাই; এখানে কিরূপে আপনার বিশ্বাস জন্মাইব।—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। জীবন মৃত্যু এখন আপনার অধীনে।"

রজনী। "না হয় বুঝিলাম, তুমি আমাদিগের বিরুদ্ধাচারিণী নও, কিন্তু এমন কি কার্য্য যে তজ্জন্য রমণী হইয়া এই গভীর রজনীতে বনে আসিয়াছ? তোমার আকার প্রকারে বোধ-হইতেছে তুমি অবশ্য কোন ভদ্র-মহিলা হইবে, কিন্তু তোমার ন্যায় সুরূপা যুবতীর কি এই উপযুক্ত কার্য্য? আবশ্যক হইলে কি অন্যের দ্বারায় সে কার্য্য সম্পন্ন হইত না।"

রমণী। "অন্যের দ্বারায় সে কার্য্য সম্পন্ন হইবার নয়।"

রজনী। "যতই মহৎ কার্য্য হউক না কেন কুল কামিনীর কি এরূপ কার্য্য শোভা পায়? এখানে দস্যু-ভয় আছে তাকি জানিতে না।"

রমণী। "জানিতাম কিন্তু কি করিব—দায়ে পড়িয়া আসিয়াছি। হয় উদ্দেশ্য সাধন, না হয় দেহের পতন, এই মনে করিয়াই গৃহের বাহির হইয়াছি।"

রজনী। "সাগরে রত্ন আছে সকলে জানে, তা বলিয়া কে তাহাতে ডুবিয়া তুলিতে যায়?"

রমণী। "যাহার রত্নের আবশ্য হইবে সে কেন না ডুবিবে?"

রজনী। "ডুবিবে, প্রাণ যাইবে।"

রমণী। "যে রত্নকেই জীবনের সার বলিয়া বোধ করে সে যদি রত্ন লাভ করিতে না পারে। তাহার জীবনে তাহা হইলে ফল কি?"

রজনী। "আবশ্যক হইলে রমণী জীবন ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু সতীত্ব রত্ন? তুমি পরম রূপ লাবণ্যবতী, একাকিনী কেমন করিয়া এই বিপদশঙ্কুল স্থানে বাহির হইয়াছ।"

রমণী বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল যখন অমূল্য সতীত্ব রত্ন হারাইব এমন বুঝিব তখন এই প্রিয় সহচরীর শরণ লইব।" রমণীর বাক্যে রজনী স্তম্ভিত হইল—মুখ মণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, বলিল "পবিত্র আত্মদান। আর তোমাকে কোন বাধা দিতে ইচ্ছা করিনা, কিন্তু মনে আকাঙ্ক্ষা রহিল বুঝিলাম না,—কোন মহৎ কার্য্যের জন্য এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। সাধ্য থাকিলে বোধ হয় তাহাতে সাহায্য করিতে পারিতাম।—এখন কোথায় যাইবে?"

"বলিতেছি" বলিয়া রমণী চকিত নয়নে একবার দস্যুদিগের মুখের দিকে চাহিল।

রজনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া দস্যুদিগকে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিল। সঙ্কেত মত দস্যুগণ চলিয়া গেল।

রজনী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, "এইবার বল কোথা যাইবে?"

রমণী। "চণ্ডীকা মন্দিরে।"

রজনী। "সেখানে গিয়া কি করিবে?"

রমণী। "ঔষধ তুলিব।"

রজনী। "কি ঔষধ ভাই?"

রমণী। "বলিতে নাই, বলিলে ফলিবে না। রাত্রি থাকিতেই লইয়া যাইতে হইবে। আপনি এমন কোনও উপায় করিয়া দিন, যেন আর কোনও বিঘ্ন না ঘটে।" রজনী "উপায় করিতেছি" বলিয়া সত্বর বাহিরে আসিল, দেখিল সূর্য্যোদয় হইয়াছে। পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "গৃহে আলোক ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি নাই—রাত্রি যে প্রভাত হইয়াছে। রমণী চমকিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে আর এ অমাবস্যায় হইল না; আরও একমাস আমায় কষ্ট করিতে হইবে।" রজনী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমিই তবে তোমার কষ্টের কারণ হইলাম।—কি কষ্ট করিতে হইবে?" "কঠিন নিয়মে ব্রতাচরণ" এই কথা বলিয়া রমণী আবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। দস্যু কন্যা বলিল ভাই, তোমার দুঃখের কথা কি, শুনিতে ইচ্ছা করি বলিতে হইবে। তুমি আমার সহিত যত বার কথা কহিয়াছ তোমার চক্ষু দিয়া ততবার এক এক বিন্দু অশ্রুপাত হইয়াছে। কথায় কথায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ কেন ভাই? অদ্য হইতে আমিও তোমার দুঃখ ভাগিনী হইলাম, আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বল। তোমার নিকট সত্য করিতেছি, তোমার কার্য্যে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাও দিব। "আইস ভাই, বৈস।" রজনী রমণীর হস্ত ধরিয়া একখানি পর্য্যাঙ্কে বসাইল! অপূর্ব্ব দৃশ্য!

রমণী বলিল, "শুনিবে?" আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, নাম শত-

দল আমি ভিন্ন পিতার আর সন্তান হয় নাই। যখন আমার বয়ঃক্রম সাত বৎসর, তখন পিতা পরলোক গমন করেন, মৃত্যুকালে বলিয়া যান "এখন শতদলই আমার জলপিণ্ড স্থল আমার সমস্ত সম্পত্তি শতদলই পাইবে। একটি গরিবের ছেলের সঙ্গে শতদলের বিবাহ দিয়া জামাইটিকে গৃহে আনিয়া রাখিও।" মাতাও তাঁহার বাক্য পালন করিয়াছিলেন। আমার স্বামী নিতান্ত নিঃস্ব,—তবে কুলিনের সন্তান। বিবাহের পর হইতে তিনি আমাদের বাটীতেই থাকিতেন। এক দিন রাত্রিতে স্বামী আমাকে বলেন শতদল একটু তামাক সাজিয়া দাও—আমার কি মন হইল আমি তাই দিই নাই, এই অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিয়াছেন।

রজনী। "এই জন্ত এত রাগ! হয়ত তুমি কোন কটু বলিয়াছিলে।"

শতদল। "বলিয়া ছিলাম, আমি পারিব না, তুমি নিজে সাজিয়া খাও। বাড়ীতে কতকগুলা চাকরাণী খাটে—শ্বশুরের ধনে এত লম্বা চাল,—তামাক টুকু পর্য্যন্ত সাজিয়া খাইতে পার না?" আমার সেই কথা শুনিয়া সে রাত্রি চুপ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল, পর দিন সকালে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেল চারিবৎসর আমার কোনও তত্ত্বাবধান করিল না, পরে শুনিলাম নূতন একটী বিবাহ করিয়াছে—তাহার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া কেমন মন খারাপ হইল, হৃদয় তুষের আগুণে পুড়িতে লাগিল—মনে হইল এত দিনে সংসারের সকল সুখই ফুরাইয়া গেল। মনের দুঃখ মনের ভিতর গোপন করিয়া আরও এক বৎসর কষ্টে কাটাইলাম। শেষে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, স্বামীর নব প্রণয়িনীকে দেখিবার বড় সাধ

হইল, মাতাকে বলিলাম "আমাকে আজই শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া দাও।" মাতা স্বীকার করিল না, বলিল, আর সেখানে কার কাছে যাইবি শতদল! তোর দশ বার বৎসর হইল বিবাহ দিয়াছি, এপর্য্যন্ত একদিনের জন্য কেহ কোন খবর লইল না। শুনিতেছি সুরেন্দ্র আবার বিবাহ করিয়াছে,—সন্তান হইয়াছে,—আর কি সেখানে স্থান পাইবি? পাঁচটা না,—সাতটা না; তুই আমার একটি মেয়ে, যেমন করিয়াই হউক তোর মোটা ভাত মোটা কাপড় ঈশ্বর জুটাইয়া দিবেন। তুই আদরের মেয়ে হয়ে সেখানে গিয়া সতা সতিনের সঙ্গে ঘর করিতে পারিবি না। তোকে পাঠাইয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না;—তবে যদি কখনও সুরেন্দ্র স্বয়ং আসিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে নিবারণ করিব না। আমি মার পায় ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কত কাঁদিলাম, কিছুতেই মা স্বীকৃত হইলেন না। পিসী মা বলিলেন, শতদলের জ্ঞান হইয়াছে,—আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছে,—ও যখন আপনা হইতে শ্বশুর বাড়ী যাইতে চাহিতেছে উহাকে পাঠাইয়া দাও। ওকি এখানে এক মুঠা খাইতে পাইবে না বলিয়া যাইতে চাহিতেছে। মাতা আর কোন আপত্তি করিলেন না, আমাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

আমার শ্বশুর বাড়ী বর্দ্ধমান। আমাদের বাটি হইতে প্রায় দশ ক্রোশ। একটি পরিচারিকা সঙ্গে করিয়া বেলা দুই প্রহ-রের সময় শ্বশুরের বাটীতে পৌছিলাম। প্রথমতঃ শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে চিনিতে পারেন নাই, পরিশেষে পরিচারি-কার মুখেই আমার বিশেষ পরিচয় পাইলেন। আমি দশ দিন থাকিলাম—ঐ দশ দিনের মধ্যে স্বামীর সহিত আমার কোনও

কথা হইল না। আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়, যদি কোনও সময়ে চোখা-চোখি হয়, মুখ ফিরাইয়া লয়। পাছে আমার সহিত কোনও কথা কহিতে হয়, সেই জন্য আমি বাটীতে থাকিলে তখন বাটীতে প্রবেশ করে না। এই সকল দেখিয়া মন এতদূর খারাপ হইল যে এক দিন আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম আবার তাহার কয়েকটি কথা মনে পড়িল, "শতদল তোমার মুখে কখনও হাসি দেখিলাম না, কখনও ভাল কথা শুনিলাম না, আমি গরিব বলিয়া কি?" এই কথা হৃদয়ে যেন শেল বিঁধিয়া আছে,—মনে করিলাম একটিবার তাহার সহিত প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া কথা কহিব, জন্মের শোধ একটি বার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিব, একটি বার হাসিতে হাসিতে তাহাকে তামাক সাজিয়া দিব, তবে আমার মরণে সুখ হইবে। আর মরিতে পারিলাম না। মনের দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আমাকে একাকিনী বসিয়া সদা সর্ব্বদা চিন্তা করিতে দেখিলে তিনি কাছে আসিয়া কত কথা বার্ত্তা কহিতেন। একদিন তাঁহাকে বলিলাম "মা আমার একটি ভিক্ষা আছে যদি অভয় দাও।" তিনি কহিলেন "কি মা কি?" আমি কহিলাম "মা আর কি বলিব—সে বড় লজ্জার কথা,—সে ঘৃণার কথা তোমার কাছে বলিতে নাই, কিন্তু আজ দায়ে পড়িয়া লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার কাছে বলিতেছি—জন্মের শোধ একটি বার তোমার পুত্রের সহিত আমার দেখা করাইয়া দাও। আমি দুর্ভাগিনী হই, সুভাগিনী হই—তোমার বধু। এক মুষ্টি অন্নের জন্য কার কাছে দাঁড়াইব মা আমার পিতার

হাজার থাক, সে ধন আমার পক্ষে থাকা না থাকা সমান। যে স্ত্রী স্বামীর অন্ন না পাইল, স্বামীর সোহাগ না পাইল, সে স্বর্গে থাকিলেও দুর্ভাগিনী। শ্বশুর গৃহে যদি কষ্টেও দিন যায়, স্ত্রীর তাহাই সুখ—মা, একথা আমি আগে বুঝি নাই—এখন বেশ বুঝিয়াছি। দাসীকে চরণে ঠেলিও না” এই বলিয়া শাশুড়ীর চরণ তলে পতিত হইলাম ও কাঁদিলাম।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, আমার স্বামীও তাঁহাকে এপর্য্যন্ত কোন কথা বলে নাই। তিনি যেন একবারে আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন “সেকি মা! তুমি ঘরের বউ কোথায় যাইবে। এমন চাঁদ পানা বউ যদি ঘরে না লইব তবে এত সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া অভয়া-নগরে আমার সুরেন্দ্রের বিবাহ দিলাম কেন! উপায় করিব, চিন্তা করিও না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমার পতির নিকটে উঠিয়া গেলেন, কি কথা হয় শুনিবার জন্য আমি অন্তরালে থাকিয়া কাণ পাতিয়া রহিলাম, শাশুড়ী বলিলেন, “এ আবার কি কাণ্ড বাধাইতেছিস? ছিঃ এখনও তোর কিছু জ্ঞান হইল না।”

সুরেন্দ্র। কি মা, কি হইয়াছে?

মাতা। বড় বউ মা যে আজ দশদিন আসিয়া কাঁদা কাটা করিতেছে, তার চোখে জল পড়িলে কি ভাল হইবে?

আমার স্বামী তখন কোন উত্তর দিল না, শাশুড়ী ঠাকু-রাণী রাগতস্বরে পুনর্ব্বার বলিলেন; “ও যদি এখানে স্থান না পাইবে তবে তখন স্বেচ্ছায় পরের মেয়ে গলায় করেছিলি কেন? যদি গলায় করিয়াছিস তবে বিনাদোষে তাড়াইবি কেন? ও আমার প্রথমকার বউ—ঘরের লক্ষ্মী ফেলিব কোথায়? তাহাতে কি তোর পৌরুষ বাড়িবে।”

স্বামী তথাপি কোন উত্তর দিল না; শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন, "জানিনা বাছা যা হয় কর। আমি আর তোমাদের সংসারে থাকিব না। আমার সতের আঠার গণ্ডা বয়স হইল, আর এ পাপের ভোগ কেন? মরণ হয়ত বাঁচি,—এ সব হাড়াই ডোমাই আর সহ্য হয় না।" বলিতে বলিতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া আমার পরিচারিকার কাণে কাণে কি একটা কথা বলিলেন। পরিচারিকা আমাকে ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করিল। সন্ধ্যা হইবামাত্র শাশুড়ী আমার সপত্নীকে সঙ্গে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "বউ মা! ও ঘরে শরৎ ঘুমাইতেছে, জাগিলে দুধ খাওয়াইও।" আমার সপত্নী পুত্রের নাম শরৎ। সন্ধ্যা হইল, পরিচারিকা বলিল, "ওগো শতদল! জামাই বাবুকে জল খাবার দাও না। তাঁরা দু শাশুড়ী ব'য়ে ভাগবৎ শুনতে গেছেন তাঁদের আসতে আজ অনেক বিলম্ব হবে, জামাই বাবুর ঘরে সব রেখে গেছেন" পরিচারিকা এই কয়টি কথা একটু উচু আওয়াজে বলিল, ভাবিলাম স্বামী এইবার বুঝি বাহির হইয়া যাইবে, কিন্তু বাহির হইল না। আমার তখন এত আনন্দ হইল যে পরিচারিকার আরও বলিবার কথা থাকিলেও আমার আর শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল না, তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে পতির গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলাম! গৃহে প্রবেশ করিয়া হাত পা কাঁপিতে লাগিল, বুকের ভিতর যেন দুর দুর করিতে লাগিল। অতিশয় আনন্দে এরূপ হইল কেন, তাহা তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। আসন পাতিতে তিনবার উল্টা হইল, গেলাসে জল ঢালিতে জলের কুজো উল্টাইয়া গেল—গৃহে কোথায় খাবার আছে অন্বেষণ

করিতে পদাঘাতে সপত্নীর দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, রেকাবে কি দিলাম তাহাত জানি না। কোনও রূপে জলখাবার সাজা-ইলাম বটে, কিন্তু স্বামীকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। যেন কে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল জিহ্বা যেন অবশ হইল। সে শয়ন করিয়াছিল; ধীরে ধীরে তাহার পদতলে গিয়া দাঁড়াই-লাম কিন্তু কিছুই বলিল না। এতক্ষণ মুখ তুলিয়া চাহিতে পারি নাই, যখন দেখিলাম, সে আমাকে কিছুই বলিল না বা উঠিয়া গেল না, তখন একটু সাহস পাইয়া চাহিয়া দেখিলাম ঘুমাইতেছে। শয্যার এক পার্শ্বে এক খানি পাখা পড়িয়া ছিল, পাখাখানি লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলাম। হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—আমার দিকে দৃষ্টি পড়িল, চক্ষু রক্ত-বর্ণ করিয়া বলিল, "তোমাকে এখানে আসিতে কে বলিল?" আমি তখন কথা কহিবার সুযোগ পাইলাম, কিন্তু একটু ভয়ে ভয়ে বলিলাম "কেহই বলে নাই, আমি আপন ইচ্ছায় আসিয়াছি, অপরাধিনী বলিয়া কি একবারে চরণে ঠেলিবে?" অপরাধ ক্ষমা করিবে না?

"তোমার ন্যায় দুর্ম্মুখী স্ত্রীর মুখাবলোকন করিব না! সেই মুখ আবার দেখাইতে আসিয়াছ?" এই বলিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া আপন মনে দেখিতে লাগিল। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে পুনর্ব্বার বলিলাম তুমি পরিত্যাগ করিলে আমার কি গতি হইবে? আমার কি আর দাঁড়াইবার স্থান আছে। আর কোথায় গিয়া কাহার কাছে দাঁড়াইব? অপরাধের কি ক্ষমা নাই—পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? স্বামীর নিকট অবলার পদে পদে অপরাধ,—সেই কথা কি এখনও মনে করিয়া রাখিতে হয়? দাসীকে পরিত্যাগ করিও না। চারি বৎসর

যাও নাই বলিয়া শতদল কাঁদে নাই, আবার বিবাহ করিয়াছ বলিয়া শতদলের চক্ষে জল পড়ে নাই, কিন্তু সেই কথা—শতদল পাপ মুখে যাহা বলিয়াছে ভবিষ্যতেও বলিবে। সুরেন্দ্র শতদলকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, হৃদয় হইতে শতদলের চিত্রখানি মুছিয়া দিয়াছে। সুরেন্দ্র বিনয়ের দাস নহে সৌন্দর্য্যের বশীভূত নহে, প্রতিজ্ঞার অনুরোধে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তুও সুরেন্দ্র সচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে পারে। সুরেন্দ্র প্রণয় বুঝে, ভালবাসা বুঝে—কিন্তু নিঃস্বার্থ। তুমি সে ভালবাসার কার্য্য কি করিয়াছ—সে প্রণয়ের চিহ্ন কি দেখাইয়াছ? যত দিন তোমার বাটীতে অন্নদাস হইয়াছিলাম, বল কোনদিন আমার চক্ষে জল পড়ে নাই? মনুষ্য হৃদয়ে কত সহিবে শতদল? তাঁহার এই কথায় আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, আর তথায় থাকিলাম না—গৃহ হইতে বাহির হইয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গৃহে গিয়া সে রাত্রি শয়ন করিয়া রহিলাম, পরদিন পিত্রালয়ে আসিলাম, ভাবিলাম যদি প্রণয়ের চিহ্ন এ জীবনে কিছু দেখাইতে পারি, তবে এ মুখ আবার দেখাইব, নচেৎ জীবনের এই শেষ অভিনয়। জীবন ব্রতের এই শেষ উদ্যাপন!

রজনী। আর বলিতে হইবে না, সব বুঝিয়াছি। তাই বুঝি তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য ঔষধ তুলিতে আসিয়াছ? তুমি চিন্তা করিও না শতদল—ইহার উপায় আমি করিব। আজ হইতে তোমার কার্য্যে আমি প্রাণপণ করিলাম।

শতদল। তুমি কি কোন্ ঔষধ জান ভাই?

রজনী। জানি না জানি সে ভার আমার। যদি তাহাকে তোমার কেনা করিয়া দিতে না পারি, তবে আমিও প্রাণ রাখিব না—এই তোমার কাছে অঙ্গীকার করিলাম।

শতদল। তা কেমন করিয়া হইবে ভাই? তাহার দৃঢ় পণ আমার আর মুখাবলোকন করিবে না।

রজনী। দূর পাগলি! সে পণ ক দিন! ঘর জামাই পুরুষদিগের আবার পণ—তাহাদের আবার রাগ! আমি অনেক দেখিয়াছি। ঘর জামাইদের গা আর গণ্ডারের গা সমান। তলোয়ারের আঘাতে কাটে না, বল্লমের খোঁচায় ফুটে না। গণ্ডারের গল্পে পড়িয়াছি, "গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল হয়, তখন এত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ছিল না, সেই জন্য সে কালের লোক ঢালের জন্য বনে গণ্ডার মারিতে যাইত। এখন যদি কোনও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত পুস্তক লেখেন তবে তার লেখা উচিত, ঘরজামাই নামক এক প্রকার গ্রামে গণ্ডার আছে, তাহাদিগের চর্ম্মে ঢাল ও বুকের হাড়ে দেবরাজের বজ্র এবং পায়ের মালাই চাকিতে গাড়ীর চাকা প্রস্তুত হয়। তাহারা ভাত খাইতে ভাল বাসে এজন্য তাহাদিগের অপর একটী নাম অন্নদাস। অন্নদাসদিগকে তাড়াইলে যায় না, আড়ে আবডালে বসিয়া উকি ঝুঁকি মারিতে থাকে, ডাকিলেই কুকুরের মত ঝাঁপাইয়া আইসে।

রজনীর কথা শুনিয়া শতদলের দুঃখের উপরেও হাসি আসিল, "বলিল" দেখা যাবে কেমন কবিরাজ, সেই হইতে শতদল রজনীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুচতুরা রমণীর চাতুরী কেমন,
ভাবিতে হৃদয় কাঁপে বিমোহিত মন।

অরুন্ধতী।

পাঠক! এক্ষণে অরুন্ধতী ঠাকুরাণীর বিষয় কিছু অবগত করাইব। ইহারই মন্ত্রণায় সেই ভয়াবহ জঙ্গলে শতদল ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে সীতাখণ্ড নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, গ্রামটী পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী এবং শ্রীসম্পন্ন ছিল, চারিশত চল্লিশ সালের বৈশাখ মাসে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া অনেক বৃক্ষাদি উৎপাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। কয়েকটি দেবমন্দির ব্যতীত ঝড়ের প্রবল প্রতাপে আর কিছুই রক্ষা পায় নাই, তাহাতে গ্রামের প্রায় তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারাও তথাকার বাস উঠাইয়া অন্যস্থানে গিয়া বাস করিল। যাহাদিগের স্থাবর সম্পত্তি ছিল, কেবল তাহারাই মমতাবশতঃ যাইতে পারিল না, প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতে লাগিল। যাহারা পলাইল, তাহাদিগের ভদ্রাসন জঙ্গল হইল, পথ ঘাটের চিহ্ন লোপ পাইল, পুষ্করিণী সকল দলদামে পুরিয়া আসিল। অরুন্ধতী ঐ গ্রামে ভগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত একটি ভগ্ন ইষ্টকালয়ে বাস করিত, বাড়ীটি প্রায়

পাঁচ বিঘা ভূমি বিস্তৃত। ভিতরে পুষ্করিণী, উদ্যান, বাঁশঝাড় প্রভৃতি অনেক প্রকার আওলাত, এবং স্থানে স্থানে দুই একটি দেবদেবীর মন্দির ছিল। বাড়ীটী হারাধন মুখোপাধ্যায়ের চারিশত চল্লিশ সালের ঝড়ে ঐ বাটীস্থ একটী দ্বিতল অট্টালিকা চাপা পড়িয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করে। গিরিধর মুখোপাধ্যায় নামক হারাধনের একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক পৌত্র তখন মাতুলালয়ে ছিল। বংশের মধ্যে সেই বাঁচিয়া যায়। গিরিধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন লোকমুখে শুনিতে পাইল যে তাহার পিতামহের অনেক সম্পত্তি ঐ বাটীতে প্রোথিত আছে; তাহা এ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হয় নাই, তখন গিরিধর মাতুলাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সীতাখণ্ডে আসিল। একটী ক্ষুদ্র ভগ্নাবিশিষ্ট অট্টালিকা মেরামত করাইয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া সময়ে সময়ে প্রোথিত সম্পত্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। গিরিধরের সন্তান হয় নাই। ঐ সকল সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহার সবধু দৌহিত্রকে আনিয়া ঐ বাটীতে বাস করাইল। তাহার নাম রামদেব ঘোষাল অরুন্ধতীর স্বামী। রামদেব প্রোথিত ধনভাণ্ডারের সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু ভোগ করিতে পায় নাই, যেদিন সন্ধান করিল, সেই দিনই তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। সেই অর্থ অরুন্ধতীর হস্তগত হয়। অরুন্ধতীর সময়ে গ্রামের পূর্ব অল্পসংখ্যক লোকের বাস ছিল। তাহাদিগের বাসস্থান এক স্থানে বা পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ ছিল না। সকলেরই বাটীর চারি ধারে গভীর বনজঙ্গল। সহসা প্রতিবেশীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার বা বাটী হইতে ডাকিয়া উত্তর পাইবার উপায় ছিল না। অরুন্ধতী যে গৃহে বাস করিতে তাহার পশ্চাদ্ভাগে জঙ্গলে একটী চোর কুঠারিতে সেই সকল সম্পত্তি নিহিত

ছিল। পাছে দস্যুতে সন্ধান পাইয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে সমস্ত সম্পত্তি তুলিয়া আনিয়া নিজের বাসগৃহের এক কোণে পুতিয়া রাখিয়াছে। সে সকল সম্পত্তি এত অধিক যে, প্রতিদিন মুক্ত হস্তে ব্যয় করিলেও তাহার জীবনে শেষ হইত না, কিন্তু অরুন্ধতী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিত না। বাটীস্থ বৃক্ষজাত ফলমূল বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অরুন্ধতী অত্যন্ত স্বার্থপর ছিল, স্বার্থের জন্য না করিতে পারিত এমন কোন কার্য্যই ছিল না।

অরুন্ধতীর বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর, দেহটি স্থূল ও দীর্ঘ, গৌরবর্ণ। মস্তকের বিরল কেশ গুচ্ছ, এবং ভ্রূ যুগল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। সম্মুখের এবং পার্শ্বের দুই একটী দন্ত ইচ্ছামত যত্রতত্র হেলিয়া কমলার চর্ব্বণশক্তির লোপ করিয়াছিল, কিন্তু মরণাবধি জিহ্বার অবকাশ ছিল না, জিহ্বাটি দন্তের ফাঁক দিয়া সর্ব্বদা উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিত, আর কতদিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

অরুন্ধতীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর হইলেও দেহ ততদূর নিস্তেজ হয় নাই। সে হরিচরণ চিহ্ন আঁকা নামাবলী গায়ে দিত, নাসামূল হইতে ললাটের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তিলক কাটিত, বাহুতে এবং বক্ষে হরিনামের ছাপ দিত;—গলায় মোটা মোটা মালা ছিল, একটী বৃহদাকার ঝুলি কণ্ঠস্থিত মালার সহিত গাঁথিয়া রাখিত। কোনও লোক জন আসিতেছে দেখিলে তাড়াতাড়ি ঝুলি হইতে একগাছি মালা বাহির করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিত। স্ত্রী সমাজে অরুন্ধতীর আর একটী মহৎ গুণের কথা প্রচার হইয়াছিল। সকলেই বলিত অরুন্ধতী ঠাকুরাণী বশীকরন, উচাটন, মারণ এবং স্তম্ভন প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছে,—তদ্দ্বারা অনেকের

অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এই জন্য অনেকানেক স্ত্রীলোক তাহার বাটীতে আসা যাওয়া করিত। শতদলও তাহাকে জানিত এবং সময়ে সময়ে টাকাটা সিকিটা প্রণামি দিত।

শতদল যখন অনেক চেষ্টা করিয়াও সুরেন্দ্রকে বশীভূত করিতে পারিল না, তখন অগত্যাই তাহাকে শরণাপন্ন হইতে হইল। অরুন্ধতী রকে বসিয়া মালা জপিতেছে, সেই সময় শতদল আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল, মালা জপিতে জপিতে কথা কহিতে নাই, সেই জন্য তাহাকে বাক্যের দ্বারায় সম্ভাষণ না করিয়া ইঙ্গিতে একখানি আসন দেখাইয়া বসিতে বলিল। শতদল ভূমিতেই বসিল। অরুন্ধতী শতদলের মুখের দিকে চাহিয়া অনন্যমনে অনেকক্ষণ মালা জপিল। জপ সমাপ্ত হইলে প্রাঙ্গনস্থিত তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিভাবে ভগবৎ চরণে দণ্ডবৎ করিল। "হরিবোল হরিবোল, হরের্ণামৈব কেবলম্ হরেরর্ণামৈব কেবলম্" প্রভৃতি ভগবানের স্তোত্র-পাঠ করিতে করিতে রকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা হতে আসিতেছ গা?"

শতদল। আমাকে চিননা দিদিঠাকরুণ! আমি শতদল, বাড়ী অভয়ানগর!

অরুন্ধতী। ওমা, আমার শতদল তুমি! আর ভাই চোখে দেখতে পাইনা, কাণে শুনতে পাইনা, খেতে পারিনা—অরুচি। ঐ—খেতে হয়, তাই চিবিয়ে চিবিয়ে দুটো খাই। এখন কোন রকমে ঠাট খানা বজায় রেখে শ্যামসুন্দরের চরণ-পদ্ম সেবা ক'রে আর তোমাদিকে রেখে যেতে পারবেই বাঁচি।

শতদল। না দিদিঠাক্‌রুণ! এখন কিছুদিন বেঁচে থাক লোকের অনেক উপকার হউক।

অরুন্ধতী। আহা শতদলের আমার কথাগুলি যেন মধু-মাখান। এবার শতদলের নিকট আসিয়া কটিদেশ নত করিয়া মুখের নিকটে মুখ লইয়া বলিল, "শতদলকে আমার কতদিন দেখি নাই—দেখি একবার মুখখানি।"

শতদল। দিদিঠাকরুণ! তুমি যে আমাকে অতিশয় ভাল বাস। ভালবাসার জিনিষ একদিন চোক্ষের অন্তর হ'লে শতযুগ মনে হয়—তাই তোমার মনে হ'চ্চে অনেক দিন দেখ নাই। না হ'লে সেদিনও তো আমাকে দেখেছ।

অরুন্ধতী। তা হবে—আর বয়স হয়েছে ভাই—সব কথা সব সময়ে মনে পড়ে না, এই বলিয়া শতদলের নিকটে বসিয়া আপাদ মস্তক বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল।

অরুন্ধতীর নিকট শতদলের স্থায় অবস্থার রমণী ব্যতীত অন্য কেহই আসিত না, শতদলের আসিবার কারণ সে অনেকক্ষণ বুঝিয়া লইয়াছে। আসল কথা তুলিবার জন্য বলিল, "আহা। শতদল ত শতদল আমার সোণার শতদল। এ শতদল যে দেবতার পায় স্থান পেয়েছে সে চারিকালের জন্য ধন্য হ'য়েছে!"

শতদল। স্থান পায় নাই দিদিঠাকরুণ—একবার পেয়েছিল ভাগ্যদোষে পা হ'তে পড়িয়ে গড়াগড়ি যাচ্চে!

অরুন্ধতী বুঝিল আর কি কলে পড়িয়াছে, বলিল "আবার ধুলাঝেড়ে পায় তুলে দিলে কি থাকে না।"

শতদল। আর সে পরম দেবতার পায় স্থান নাই;—যেমন প'ড়ে গেছে, অমনি বামনঠাকুর সেই জায়গায় আর একটী ফুল পরিয়ে দিয়েছে।

অরুন্ধতী। দেবতা কি বলে এখন?"

শতদল। দেবতা কি আর কথা কয়?

অরুন্ধতী। ভক্তি থাকলেই কয়।

শতদল। ভক্তি কে শিখাবে,—এমন লোকত এতদিন পাই নাই,—এখন দৈববশতঃ পেয়েছি, আমায় শিখিয়ে দাও।

এইবার অরুন্ধতী সানন্দে কল চালাইল,—বলিল, "তাই ত দিদি,—ভক্তি শিখান যে শক্ত কথা।"

শতদল বুঝিল, অরুন্ধতী কিছু বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। বলিল, দিদিঠাকরুণ! যদি পার তাহা হইলে এই দামী হারগাছটি তোমার।"

শতদল তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ হইতে মুক্তাহার খুলিয়া অরুন্ধতীর গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

অরুন্ধতী হারগাছটি হাতে লইয়া কৃত্রিম আপ্যায়িত করিয়া কহিল "ওমা এ আবার কেন—এ তুমি নাও। শতদল! তুই কি আমার পর ভাই তোর একটা উপকার করবো তার জন্য কি আর এত টাকার হার ছড়াটা দিতে হয়। তা দিতেছিস, দিয়েছিস,—শ্যামসুন্দরের এখন সেবার জন্য তুলে রাখবো, আমি কি লইতে পারি।" এই বলিয়া হারগাছটী কণ্ঠস্থিত হরিনামের ঝুলির মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

শতদল বলিল, "এইবার দেখবো দিদিঠাকরুণ! কেমন গুণপণা।"

অরুন্ধতী। আমার গুণের ব্যাখ্যা করে কত কুলের কুলনারী।
আমি, মৃণাল সুতায় বাঁধতে পারি মদমত্ত করী।
মন্ত্র বলে মাঘের শীতে আগুন জ্বালাই জলে,
শশীর কিরণ জমাট বেঁধে শুকিয়ে রাখি তুলে।
ফুলের বায়ে গলিয়ে পাষাণ বহাই প্রেমের নদী,

ভেককে নাচাই ফণী শিরে মনে করি যদি,
চিত্র ক'রে কমল কলি, ঝরাই তাতে মধু,
কমল বনের ভৃঙ্গ এনে মানিয়ে তুলি শুধু।

এইরূপ চটকদার শ্লোকে শতদলকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিল, "একবার এইখানে ব'স ত দিদি, আমি ও ঘরে গিয়ে তোমার নামে বেশ করে সঙ্কল্পটা ক'রে আসি। দেখ ওদিকে কদাচ যেন যেও না, তা হ'লে ওষুদ ফলবে না।"

শতদল। আমার আর যাবার আবশ্যক কি—তুমি যাও।

তখন প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অরুন্ধতী ঘর হইতে বাহির হইল—খিড়কির দিকের একটি ভগ্ন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্ষণেকের জন্য কোথায় চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা লোককে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পথে বাটীতে আসিয়া একটা ভগ্ন দেব মন্দিরে প্রবেশ করিল। শতদল তাহা কিছুই জানিল না।

ঘোর অন্ধকারময় মন্দিরাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া অরুন্ধতী বলিল, "যাদব, তোকে ডেকেছি কেন জানিস্! তোকে একটা কাজ করতে হবে।"

অরুন্ধতীর সহিত যে আসিয়াছিল তাহার নাম যাদব। যাদব বলিল, "কি কাজ মা ঠাকরুণ?"

অরুন্ধতী। আমার কাছে একটা ছুঁড়ী এসেছে।

যাদব। তবেত দেখচি তার বড় বিপদ মা ঠাকরুণ। তুমি ফিরিয়ে দাওগে না, বলগে আমার আজ একাদশী—রাঁদি নাই।

অরুন্ধতী। দুর মুখপোড়া হাড় হাবাতে, আজ যে অমাবস্যা।"

যাদব। বটে—

অরুন্ধতী কথাটা চাপিয়া গেল, বলিল,—"না না আমি কি তা পারি, আমি ওটা তোর মন বুঝে দেখ্‌লাম। সরলমতি যাদব অমনি দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া "এঁ্যা মা ঠাকুরুণ শিষ্যের সঙ্গেও তোমার তামাসা" এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

অরুন্ধতী শতদলের নিকট আসিয়া বলিল, "শতদল! এতক্ষণের পর সঙ্কল্প কর্‌া সমাধা হইল, এখন তোমাকে একটি কঠিন কাজ করিতে হইবে।

শতদল। কি করিতে হইবে বল ?

অরুন্ধতী। হেঁপোর বিলের দক্ষিণে যে একটা খুব বড় জঙ্গল আছে জানিস ?

শতদল। হাঁ তা জানি।

অরুন্ধতী। সেই বনের ভিতর একটি মন্দির আছে !—

শতদল! শুনেছি, সেখানে একটা ভাঙ্গা মন্দির আছে, তাতে এক চণ্ডী আছেন।

অরুন্ধতী। এই রাত্রিতে তোকে সেই মন্দিরে গিয়ে চণ্ডীর হোমের একখানি আধ পোড়া মড়ার কাঠ আনতে হবে—পারবি ?

অরুন্ধতী বাক্যে শতদল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল যে তাহা হইতেই তাহার প্রাণের সুরেন্দ্রকে পাইবে, বলিল, "পারিব।" ভাবিল, যাহা হয় হইবে। শুনিয়াছি সেখানে অনেক দস্যু আছে, মরি দস্যুর হাতেই মরিব, আর এত যন্ত্রণা সহ্য হয় না। অরুন্ধতী ভাবিল, আজ অমাবস্যা! দস্যুগণ অমাবস্যায় নরবলি দিয়া চণ্ডীর পূজা করে, শতদল গিয়া তাহাদের খর্পরে পড়িবেই পড়িবে। কৌশল করিয়া এখন গহনাগুলি সব খুলিয়া লইতে পারিলেই হইল—বলিল ও ভাই শতদল! এই অমাবস্যা থাকিতে

থাকিতে তোমাকে তিন ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, ঔষধ লইতে হইবে। এখন প্রায় এক প্রহর রাত্রি গত হইল—আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র চণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া বাহির হও। যাহা যাহা করিতে হইবে, বলিয়া দিতেছি,—বনের দক্ষিণ ধারে যে একটি খুব উচু দেবদারু গাছ আছে, সেখানে গেলে যে গাছ অগ্রেই দেখিতে পাইবে তাহারই নীচে দিয়া চণ্ডীর মন্দিরে যাইবার পথ। সেই পথে খানিক গিয়া একটী বড় পুষ্করিণী পাইবে, তাহারই উত্তর পাড়ে সেই মন্দির। সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে এলো কেশে মন্দিরে প্রবেশ করিও। যদিও কাহারও সহিত তোমার দেখা হয়, জিজ্ঞাসা করিলে কদাচ কথা কহিও না। মন্দিরে প্রদীপ থাকে, প্রবেশ করিলেই দেখতে পাইবে অনেক হোমের কাঠ পড়িয়া আছে। আমি আত্মসার করিয়া দিলাম, কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না, ঔষধ লইয়া নিরাপদে আসিতে পারিবে। শতদল সরল মনে নিঃসন্দেহে যাইতে প্রস্তুত হইল।

অরুন্ধতী আবার বলিল, “তোমার যে সকল অলঙ্কারগুলি সুতায় গাঁথা সেগুলি খুলিয়া যাও, গায়ে সুতা রাখিতে নাই।”

শতদল বলিল, “কাপড় যে সুতার।”

অরুন্ধতী। তাহার এক উপায় করিয়াছি,—এই আমার পাটের কাপড় খানা পরিয়া যাও। এই বলিয়া একখানি অতি জীর্ণ পট্টবস্ত্র শতদলের সম্মুখে ধরিল। শতদল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া একে একে গাত্রস্থিত সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া অরুন্ধতীকে রাখিতে দিল, কেবল পতির মঙ্গলার্থে হস্তের বালা দুগাছি খুলিল না।

অরুন্ধতী বলিল, "শুভক্ষণ হইয়াছে যাত্রা কর—শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি।"

শতদল শ্রীহরি স্মরণ করিয়া যাত্রা করিল। ধন্য নারীর চাতুরি! ইহারি নাম ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনের আবেগে পথিক গৃহ পরিহরি।
যথেচ্ছা চলিল পেতে শান্তিময় পুরী॥

সব সাধক।

সুরেন্দ্র শতদলকে তামাক সাজিতে বলিয়া যখন শতদল কর্ত্তৃক সুন্দর জবাব পাইল, তখন স্তম্ভিত হইয়া একবার শতদলের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল তাহার মুখমণ্ডল একটু আরক্তিম হইয়াছে, নয়ন যুগলে যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটিতেছে, ওষ্ঠাধর দুইখানি ঘন ঘন কাঁপিতেছে, বলিল, "শতদল তুমি রাগ করিলে?"

শতদল নীরব,—দেহলতা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া উপাধানে মুখখানি লুকাইয়া অভিমান ভরে রোদন আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ভাবিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিল, "এতদূর আচ্ছা" এই বলিয়া শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে আর সুরেন্দ্রকে কেহ দেখিতে পাইল না। সুরেন্দ্র অন্তর্দ্ধান।

সুরেন্দ্র ঘোর শ্মশানে। শ্বশুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সারাদিন পথ হাঁটিয়া দিবাবসান কালে সুরেন্দ্র এক শ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। শ্মশান ক্ষুদ্র নহে—যোজন পরিমিত

ভূমি বিস্তৃত। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চিতার অসংখ্য শ্রেণী চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নিবিড় পল্লব বিশিষ্ট কণ্টক-ময় বৃক্ষ। তাহাদের শাখা প্রশাখা সকল ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইয়াছে, ভিতরে ক্ষুদ্র বল্মীক স্তূপ কোথাও বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর দৃষ্ট হইতেছে, শৃগালাদি বন্য পশুগণ তন্মধ্যে নির্ভয়ে বাস করে। কোথাও গৃধ্র সকল বৃহৎ পক্ষ বিস্তার করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, কোথাও শৃগাল কুক্কুর সকল মৃত দেহ লইয়া আনন্দ কোলাহল করিতেছে। কোথাও রাশিকৃত নর অস্থি পঞ্জর, কোথাও দশনসহ নরশির, কোথাও দগ্ধাবশিষ্ট শব কাষ্ঠ, কোথাও বা ভগ্ন হুক্কার সহিত ভগ্ন কলিকা পতিত রহিয়াছে। দুষ্ট রাখাল বালকেরা পথিকদিগের মনে ভয়োৎ-পাদন করিবার জন্য বৃক্ষ শাখায় শবমুণ্ড মালা ঝুলাইয়াছে, শবের কলস সকল উপর্য্যুপোরি সজ্জিত করিয়া ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, রাত্রিকালে হঠাৎ দেখিলেই হৃদয়ে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পার্শ্বে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অশোক, চম্পক কদম্ব কেতকী প্রভৃতি বহুবিধ বন পুষ্প শোভমান। শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় মিশামিশি। ভিতরে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। বনের চারি দিকে কণ্টক লতা সমূহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া মানবের প্রবেশ পথ অতি দুর্গম করিয়াছে। যথা শ্মশান ভীতিজনক ও প্রীতিজনক সত্য, তবে দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে ভীতিজনক ও উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক। সুরেন্দ্র শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া বনের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া কি ভাবিতেছে ও দেখিতেছে।

এরূপ জনশ্রুতি আছে, এই ঘোর শ্মশানে এক সন্ন্যাসী বাস করেন। তিনি শব সাধনের দ্বারায় তাঁহার অভীষ্ট দেব-

তাকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া অভিলষিত বর লাভ করেন তিনি জিতেন্দ্রিয়, মায়ামুক্ত, নির্ব্বিকার। গভীর রজনীতে একাকী শবের উপরে বসিয়া দেবারাধনা করেন, রজনী শেষে কোথায় লুক্কায়িত হন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। সময়ে সময়ে শ্মশানে চিতার উপর কেহ কেহ রক্ত চন্দনের চিহ্ন ও জবাফুল পতিত থাকিতে দেখিয়াছে মাত্র। কোনও সাহসী যুবক তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোনও নিভৃত স্থানে বসিয়াছিল অকস্মাৎ ভূতে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আজ সুরেন্দ্র সেই ভীমকর্ম্মা সন্নাসীর নিকট যাইবার জন্য এই ভয়ঙ্কর শ্মশানে আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইল নীলাকাশে চন্দ্র উঠিল, তারাগুলি মিটি মিটি করিয়া ফুটিল, সুরেন্দ্র ভাবিতেছে সে সন্ন্যাসী কোথায়। একটী অশ্বথ বৃক্ষের মূল দেশে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া একতান মনে ভাবিতেছে, সে সন্ন্যাসী কোথায়। বনে শৃগাল ডাকিল, বৃক্ষের নিশাচর পক্ষী উড়িল, সম্মুখ দিয়া কত কি সব চলিয়া গেল, সুরেন্দ্র শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় সেই এক স্থানে দণ্ডায়মান— কেবল ভাবিতেছে, সন্ন্যাসীর কোথায় সাক্ষাৎ পাইব। ক্রমে রজনীর গভীরতা বাড়িল, জগৎ প্রায় সুষুপ্ত হইল, চন্দ্র ক্রমে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল, অন্ধকার বিকট বেশে নিকটে আসিতে লাগিল, তত্রাচ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইল না। সেই সময়ে একবার সেই শ্মশানের দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল ভয়ঙ্কর! সম্মুখে একখানি অতি শীর্ণ মানব দেহ দণ্ডায়মান। দৃষ্টি ভ্রমে কোনও শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকে মানব দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া একবার নয়নদ্বয় উত্তম রূপ মার্জ্জন করিল, কিন্তু মনের ভ্রম দূর হইল না। এবার

আবার দেখিল, সেই শীর্ণকায় দেহ ধীরে ধীরে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে;—একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে মানবদেহ সম্মুখবর্ত্তী হইল—এত নিকটে যে, তাহার ছায়া আসিয়া সুরেন্দ্রের পদতল স্পর্শ করিল। চন্দ্রালোকে সুরেন্দ্র বিশেষরূপে দেখিল, তাহা একখানি কেবল অস্থি পঞ্জর! এবার তাহার হৃদয় কাঁপিল, ওষ্ঠ শুকাইল, কিন্তু পলাইল না। যাঁহারা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা হইলে তৎক্ষণাৎ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইতেন। সুরেন্দ্র সামান্য কারণে ভয় পাইবার লোক নহেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাহস অপরিসীম। ভূত বলিয়া যে কোন একটা জীব আছে, তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। অস্থি পঞ্জরখানি ক্রমে ক্রমে সুরেন্দ্রকে পশ্চাৎ করিয়া পথের উপর আসিয়া নামিল—ক্রমে পথ পার হইল—সুরেন্দ্রও সাহসে তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।

সেই নরকঙ্কাল বনমধ্যে প্রবেশ করিল,—পশ্চাতে সুরেন্দ্র। বনে বনে বহুদূর গিয়া কঙ্কাল মূর্ত্তি একখানি পর্ণকুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইল—কুটীরের দ্বার অকস্মাৎ মুক্ত হইল। ভিতরে অগ্নি জ্বলিতেছে। তদীয় আলোকে, সম্মুখস্থিত বৃক্ষ সকল উদ্ভাসিত হইল, আপাদ মস্তক নরকঙ্কাল প্রকাশ পাইল। দেখিল, তাহা একটী মনুষ্যের স্কন্ধদেশে রহিয়াছে। কুটীরাভ্যন্তে তেজঃপুঞ্জ এক সন্ন্যাসী তাহার মস্তকে দীর্ঘ জটাভার, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, অঙ্গে বিভূতি, কটীতে বল্কল, গলে সুগোল রুদ্রাক্ষ মালা। সুরেন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, সন্ন্যাসী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

জলদ গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী নরকঙ্কাল বাহীকে জিজ্ঞাসিল, "বিপ্রদাস! ইহা কোন কঙ্কাল?" কঙ্কালবাহীর নাম বিপ্রদাস

বিপ্রদাস উত্তর করিল "এহা সেই চণ্ডালের অস্থি, যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল।" সন্ন্যাসী অস্থিপঞ্জরখানি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ইহার দুইখানি বক্ষের অস্থি কোথায় পড়িয়াছে, ইহাতে কখন কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। তুমি ইহা কি জন্য আনিয়াছে?"

বিপ্রদাস। আমি এই শবের কটিদেশ ধরিয়া স্কন্ধে বসাইয়া অতি সাবধানে লইয়া আসিয়াছি।

সন্ন্যাসী। যাও, শীঘ্র যাও কোথায় পড়িয়া আছে অনুসন্ধান করিয়া এখনি লইয়া আইস।

বিপ্রদাস পুনর্ব্বার সেই শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল,—সুরেন্দ্র ভয়সঙ্কুল বিজন কান্তার মধ্যে। সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও এ সময়ে এরূপ স্থানে কোন লোক সমাগমের সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাসী হঠাৎ অপরিচিত একজন যুবকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, গম্ভীর বচনে বলিলেন, "কে তুমি?"

সুরেন্দ্র সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎ সমীপবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণাম করিল, বলিল, প্রভু! দাসের নাম সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সন্ন্যাসী। হা কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ! এখানে তুমি কি জন্য আসিয়াছ? শীঘ্র পলায়ন কর—নতুবা প্রাণ যাইবে। তোমার পশ্চাতে কে তাহা দেখিতে পাইতেছ না; এখনি তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শোষণ করিবে। পলাও—পলাও, শীঘ্র পলাও, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। সুরেন্দ্র কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সাহসে কহিল, প্রভো! দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন, পাদপদ্মে আশ্রয় দিউন। দাস অতি অধম—চরণে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, কিন্তু একান্ত শরণাগত আমাকে অভয় পদ ছাড়া

করিবেন না। আপনার কৃপাবল সম্বল করিব ভাবিয়া এই বিপদসঙ্কুল স্থান জানিয়াও আসিয়াছি। সন্ন্যাসী ক্রোধ কর্কশস্বরে, বিকৃত মুখে কহিল, "শরণাগত, তিষ্ঠ মূঢ়—দেবী চামুণ্ডাই তোরে এখানে পাঠাইয়েছেন এখনি বধ করিতেছি" এই বলিয়া একখানি শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন, ভীমবেগে সুরেন্দ্রকে কাটিতে গেলেন। সুরেন্দ্র নির্ভয়ে যোড়করে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও নড়িলেন না, সন্ন্যাসী অস্ত্র ফেলিলেন, বলিলেন "কি চাও?"

সুরেন্দ্র। প্রভো! আর কি চাহিব, কেবলমাত্র পদাশ্রয়।

সন্ন্যাসী। অন্য কিছু প্রার্থনা কর।

সুরেন্দ্র। আমার অন্য কিছু অভিলাষ নাই।

সন্যাসী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ! তোর জ্ঞান কোথায়? অভিমান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সাধনা হয় না। তোমার এ বৈরাগ্য যে শুদ্ধ শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। গৃহে গিয়া আপন সংসার ধর্ম্ম পালন কর,—মঙ্গল হইবে।" সুরেন্দ্রের নয়ন সজল হইল, কোনও কথা বাহির হইল না। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "এখানে থাকিলে অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে হইবে, পারিবে?"

সুরেন্দ্র। প্রভুর যখন যে আদেশ হইবে, দাস প্রাণ দিয়াও তাহা প্রতিপালন করিবে। কখনও তাহার অন্যথা করিবে না।

সন্ন্যাসী। তবে যাও, এই দণ্ডে মহাশ্মশান হইতে একটা মৃতদেহ এই স্থানে লইয়া আইস—অভাব নাই, বিস্তর পড়িয়া আছে।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সুরেন্দ্র নির্ভিকচিত্তে তৎক্ষণাৎ শ্মশানা-

ভিমুখে ধাবিত হইল। আর তখন আকাশে চন্দ্র নাই। চারিদিক ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন! জগৎ নিস্তব্ধ—জীবকুল নিদ্রিত। কচিৎ দুই একটি নিশাচর পশু পক্ষী জাগিয়া আছে,—আর জাগিয়াছে আকাশে তারকা পুঞ্জ, শ্মশানে সুরেন্দ্র, আর অরণ্যে সেই সন্ন্যাসী আর বিপ্রদাস। সুরেন্দ্র শ্মশানে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্রালোকে অল্প অল্প দেখিতে পাইল, সম্মুখে অনতিদূরে কয়েকটা শৃগাল একত্র মিলিয়া কি একটা পদার্থের নিকট বেগে যাইতেছে, আবার পিছাইতেছে। দুই তিনবার এইরূপ করিতে দেখিয়া সুরেন্দ্র আরও নিকটবর্ত্তী হইল, শৃগাল কয়েকটা পলাইল। সুরেন্দ্র দেখিতে পাইল তাহা মৃতদেহ, তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে তাহা স্কন্ধে তুলিয়া, দুই এক পদ যাইতেছে; সেই সময়ে হঠাৎ শ্মশান ভূমি আলোময় হইল, ঝোপ ঝাপ চিতা, শবদেহ, শব কলস, সমস্তই লক্ষিত হইল। দেখিল সম্মুখে সেই রুদ্রমূর্ত্তি সন্ন্যাসী, একটী প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে শ্মশানবক্ষে দণ্ডায়মান। সুরেন্দ্রের স্কন্ধদেশে, দশম কিম্বা একাদশ বর্ষ বয়স্কা একটি বালিকার মৃতদেহ। তাহার পদদ্বয় সুরেন্দ্রের বক্ষভাগে, বাহুদ্বয়, মস্তক ও নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠভাগে লম্বমান। অধিক ভারপ্রাপ্ত হইয়া মন্থর গমনে বনের দিকে চলিতেছে। অতি মনোহর দৃশ্য! সে দৃশ্য কেমন করিয়া পাঠক পাঠিক হৃদয়ে আঁকিয়া দিব বলুন! পাঠক! এই সময় এক বার আলুলায়িত কুন্তলা ছিন্ন ভিন্ন বেশ সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধূর্জ্জটীর সেই হৃদয় বিদারক চিত্র স্মরণ করুন, যে সময় ঈশাণ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে মৃত বালিকার দেহ স্কন্ধে সুরেন্দ্রের চিত্রও হৃদয়ে কল্পিত হইবে। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রের সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "তিষ্ঠ, আর তোমার

যাইতে হইবে না।" সুরেন্দ্র দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালিকার মৃত-দেহ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সুরেন্দ্র! বালিকা-টীকে বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছিল; বিষে ইহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার আত্মীয়গণ মৃতজ্ঞানে ইহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়াছিল। কি দারুণ ভ্রম! উহার প্রাণবায়ু এখনও বহির্গত হয় নাই, ঔষধ প্রয়োগ করিলে বোধ হয় বাঁচি-তেও পারে। তুমি ইহাকে তোমার কুটীরে লইয়া যাও—ধীরে ধীরে ইহার দুটী চরণ নামাইও, যেন কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়, আমি আসিতেছি।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, সুরেন্দ্র বালিকার দেহ লইয়া কুটীর মধ্যে স্থাপিত করিল। অনতি-বিলম্বে কতকগুলি লতা পাতা হস্তে করিয়া সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বালিকার সর্ব্বাঙ্গে তাহার রস মাখাইতে লাগিলেন,—তাহাতে কোন প্রকার ফল দর্শিল না। সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "কুটীরে ছুরিকা আছে, শীঘ্র আমার নিকট লইয়া আইস।" সুরেন্দ্র ছুরিকা আনিলে বালিকার দেহের স্থানে স্থানে বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ঔষধের রস প্রবিষ্ট করাইতে লাগি-লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেহের অনেক বিবর্ণতা দূর হইল, অল্প অল্প নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। সুরেন্দ্র সন্ন্যাসীর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া একবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকা ধীরে ধীরে মুখব্যাদন করিয়া যেন কিছু খাইতে চাহিল। সন্ন্যাসী সেই সকল লতার রস নিষ্পীড়ন করিয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন। বালিকা অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিল। এদিকে সন্ন্যাসীর সাধনার সময় উপস্থিত, বিপ্রদাস আসিয়া কহিল, "প্রভো! অস্থি পাওয়া গিয়াছে।"

সন্ন্যাসী। এখন রাত্রি কত?

বিপ্রদাস। এখন প্রায় তিন প্রহর অতীত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী। চল, যাইতেছি।

বিপ্রদাস নরকঙ্কালখানি পূর্ব্বমত স্কন্ধে বসাইয়া কোথায় চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রকে কহিলেন, "সুরেন্দ্র! যাবৎ বালিকার দেহের বিবর্ণতা সম্পূর্ণরূপ দূর না হয়, তাবৎ এই সকল পত্রের রস মাখাইয়া দিও; কিছু খাইতে চাহিলে শুদ্ধ ইহারই রস প্রদান করিও, আমি আসিতেছি। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্র বালিকার নিকট বসিয়া অঙ্গে ঔষধ মাখাইতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। নানাবিধ পক্ষীর কলরবে বনভূমি মাতিয়া উঠিল। কদম্ব কেতকী প্রভৃতি বিবিধ বন-কুসুমের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। জীবের পরিশ্রমজনিত আর অশান্তি নাই, তরু লতায় মলিনতা নাই। সারাদিন রবির উত্তাপে দগ্ধ হইয়াছিল, রজনীর সুশীতল বক্ষে ঘুমাইয়া এখন সকলেই প্রফুল্ল। মধুর বায়ু বহিল, আকাশে নব অরুণ উঠিল; মধুপান ছলে অলি আসিয়া কুসুমের কাণে কাণে বলিয়া গেল, "কুসুম! যদি হাসিয়াছ, তবে মুখের হাসি মুখে থাকিতে জগতের কিছু উপকার করিয়া লও, এখনি দারুণ তপন কিরণে দগ্ধ হইবে, কোমল দেহ ভূমে লুটিবে। ঐ দেখ, কাল যারা হাসিয়াছিল আজ তারা ভূতলে লুণ্ঠিত—পদতলে দলিত! সে অহঙ্কার নাই,—সৌন্দর্য্য নাই—প্রফুল্ল নাই। দেহ আজ আছে কাল নাই, সে দেহ—সে জীবন লইয়া কি করিবে? যে দেহ হইতে কিছুই হইল না, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় যেমন ফুটিল আবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইল, সে দেহ—সে জীবন এখনও রাখিয়াছ? পরোপকারে ঢালিয়া দাও। ওরূপ সুন্দর পবিত্রতা অপর আর

কিছুতেই নাই, তোমার মত কত শত ফুটিল, আবার কোথায় তাহারা চলিয়া গেল ; দেখিয়াও কি শিখিতেছ না। ফুলমুখে মধু ঝরিল। বালিকা অমনি ধীরে কথা কহিল, কিন্তু অতি অস্পষ্ট ও ক্ষীণ। সুরেন্দ্র কিছুই বুঝিল না, বলিল,—"এখন তুমি কেমন আছ? বালিকা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "আমার কি হইয়াছে?" আমিত বেশ সুস্থ আছি।

সুরেন্দ্র। তোমার অসুখ হইয়াছিল।

বালিকা। এখন আর আমার কোন অসুখ নাই। আমি কোথায় আসিয়াছি বল?

সুরেন্দ্র। পরম কারুণিক গুরুদেবের আশ্রমে।

বালিকা। গুরুদেব কে?—আমি ত তাঁহাকে চিনি না

সুরেন্দ্র। তাঁহাকে তুমি দেখ নাই।

বালিকা। তুমি কে? তোমার পরিচয় দাও।

সুরেন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অবসর পাইলেন না। একটি বৃক্ষান্তরাল হইতে প্রশ্ন হইল, "সুরেন্দ্র! এখন বালিকা কেমন আছে?" সুরেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী। বলিল, "ভাল আছে।" সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বালিকা উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উঠিতে পারিল না। "থাক মা থাক, আর উঠিতে হইবে না" স্নেহ ভাবে এই কথায় নিবারণ করিলেন। তিন চারি দিন চিকিৎসিত হইয়া বালিকা সুস্থতা লাভ করিলে এক দিন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মা! আরত তোমার কোন অসুখ নাই?"

বালিকা। না প্রভু।

সন্ন্যাসী। এখন চলিতে পারিবে?

বালিকা। হাঁ পারিব।

সন্ন্যাসী। তোমার পিতার নাম কি বল দেখি?

বালিকা কোন কথা কহিল না। স্মীতমুখে সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার বলিলেন, "পিতার নাম বলিতে কোন দোষ নাই—বল।" বালিকা একাগ্র মনে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আমার স্মরণ হয় না—স্মরণ করিয়া বলিব।"

"ভাল, তাহাই বলিও" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ক্ষান্ত হইলেন। বালিকা সন্ন্যাসী কুটিরেই অবস্থান করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মায়া মোহ বিবর্জ্জিত যিনি যোগীবর,
মায়ার প্রভাবে তিনি কাতর অন্তর।

মায়ার প্রতাপ।

মনের সুখে বালিকা সন্ন্যাসীর কুটীরে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। পিতামাতার স্নেহ বুঝিল না—ভাই ভগিনীর ভালবাসা বুঝিল না—সংসারের সুখ কিছুই বুঝিল না, বুঝিল সন্ন্যাসীই তাহার পিতা, বিপ্রদাস ও সুরেন্দ্র তাহার ভ্রাতা এবং অরণ্যেই তাহার সুখের স্থানেই জন্মস্থান। কখন মনের আনন্দে কুসুম চয়ন করিয়া মাল্য রচনা করে, কখন বা বন্য পশু পক্ষীর সহিত খেলিতে থাকে, কখন বা ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতে সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। এইরূপে প্রায় একমাস অতিবাহিত করিলে একদিন সন্ন্যাসী তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি মা, এত দিনের পর পিতার নাম স্মরণ হইল কি?"

বালিকা। না।

সন্ন্যাসী। ভাল মা তোমার নাম কি?

বালিকা। আমি তাহাও বলিতে পারি না।

সন্ন্যাসী বিপ্রদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিপ্রদাস! বালিকাটী পূর্ব্বকথা কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না, আমিও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াও কোন সন্ধান করিতে পারি নাই, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?" বিপ্রদাস একটু ভাবিয়া বলিল, "গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞাপন দিলে হয় না কি?" বোধ হয়, তাহা হইলে কোন উপকার হইতে পারে।

সন্ন্যাসী। আমিও তাহাই মনস্থির করয়াছি। তুমি কাগজ কলম ও দোয়াত লইয়া আইস। আজ্ঞামাত্র বিপ্রদাস সমস্তই আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী যথারীতি কয়েকখানি বিজ্ঞাপন লিখিয়া বিপ্রদাসের হস্তে দিলেন। বিজ্ঞাপনগুলি লইয়া বিপ্রদাস বাহির হইতেছে, বালিকা ডাকিল, "বিপ্রদাদা! তুমি কোথায় যাইতেছ?"

"দূর পোড়ারমুখি, শুভকাজে পাছু ডাক্‌লি!" বলিয়া বিপ্রদাস তখনি ফিরিল। বালিকা বলিল, "তুমি কোথায় যাইতেছ, আমাকে বলিতে হইবে।"

সন্ন্যাসী। ও যেখানে ইচ্ছা যাক্ না কেন মা, তোমার তাহা শুনিয়া কাজ কি?

বালিকা। আমি বুঝিয়াছি, আমাকে তুমি কোথায় দিয়া আসিবে। বাবা! আমি কি দোষ করিয়াছি যে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্থান পাইতে পারিব না! বালিকা এ কথা তাঁহাদের কথোপকথনেই বুঝিয়াছিল। বালিকার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "তুমি আমায় মায়া জড়িত করিতেছ।"

বালিকা। বাবা! ও কাগজ কি হইবে?

সন্ন্যাসী। তোমাকে তোমার পিতামাতার নিকট পাঠাইবার জন্য এই বিজ্ঞাপনগুলি দেওয়া হইবে। যদি তুমি তোমার পিতার নাম কিম্বা তোমার নিজের নাম বলিতে পারিতে, তাহা হইলে আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে হইত না।

বালিকা বেশ বুঝিল, সে তাহার নাম বলিতে পারে নাই বলিয়া জন্মের মত বিসর্জ্জিত হইতেছে—তখন মহা দুঃখে বলিল, "আমার নাম শ্মশান-বাসিনী, সন্ন্যাসী তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সুন্দর নাম, এ নাম কোথায় পাইলে?"

বালিকা। সুরেন্দ্র দাদার কাছে পাইয়াছি।

পাঠক! এখন হইতে বালিকাকে আমরাও শ্মশান-বাসিনী বলিয়া ডাকি। অন্যমনস্কবশতঃ নামটি বিপ্রদাসের ভাল কর্ণগোচর হয় নাই, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, "কি নাম, কি নাম?"

উত্তর। শ্মশান-বাসিনী।

"তুমি শ্মশান-বাসিনী নাম ধারিণী রাক্ষসী। আর পাছু ডাকিস্ নে" বলিয়া বিপ্রদাস দুই-এক পদ যেমন গমন করিয়াছে, "না ডাকিবে না—কোথায় যাইবে বল না," বলিয়া শ্মশান-বাসিনী ছুটিয়া গিয়া বিপ্রদাসের হাত হইতে বিজ্ঞাপনগুলি কাড়িয়া লইল এবং স্মিতমুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। "ঐ যা! আবার! দাঁড়া তোর হাড় ভাঙ্গিতেছি," বলিয়া বিপ্রদাস, ধরিতে গেল, শ্মশান-বাসিনী দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর পশ্চাতে গিয়া, "দেখনা বাবা বিপ্র দাদা আমাকে মারিতে আসিতেছে," বলিয়া দাঁড়াইয়া থিল্ থিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী। তুমি সব কাগজগুলি ছিঁড়িয়া দিলে, তোমাকে মারিবে না কেন?

শ্মশান। আমি আর কোথাও যাইব না।

সন্ন্যাসী। তা'কি হয় মা! এ বন মধ্যে তোমাকে আর কোথায় স্থান দিব? তোমার জন্য আমার যে তপ, জপ সব নষ্ট হইল। আমি তোমাকে কদাচ এখানে রাখিতে পারিব না—আমি যোগী—সন্ন্যাসী—ফল মূল আহার করি, পর্ণ-কুটীরে বাস করি, তুমি এ কষ্ট সহিতে পারিবে না। বাটী পাঠাইলে, তোমাকে পাইয়া তোমার পিতামাতা কত সন্তুষ্ট হইবেন। আমি তোমার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দিব।

শ্মশান-বাসিনীর নয়ন দুইটি জলময় হইল, "আমি থাকিলে যদি তোমার তপস্যা নষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি যাইব" বলিয়া বিপ্রদাসকে বলিল, "বিপ্র দাদা! কোথা যাইতেছিলে যাও। একবার ত আমি মরিয়াছিলাম, না হয় এবারেও মরিব, আর কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না।" শ্মশান-বাসিনী সুরেন্দ্রের নিকটে পূর্ব্বকথা শুনিয়াছিল, তাই বলিল, "একবার মরিয়াছিলাম।" বিপ্রদাস একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিল। তখন কুটীরাভ্যন্তরে সুরেন্দ্র পাঠ করিতেছে,—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।"

সন্ন্যাসী বলিল, "কি ভাবিতেছ বিপ্রদাস?"

বিপ্রদাস। বিজ্ঞাপন—

সন্ন্যাসী। আর বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নাই। কোন রাজ-পুরুষের হস্তে উহাকে সমর্পণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বাক্যের দ্বারায় জ্ঞাপন করিও। তাঁহারাই উহার পিতামাতার অনুসন্ধান

করিয়া আপন বাটীতে পৌঁছাইয়া দিবেন। "যে আজ্ঞা," বলিয়া বিপ্রদাস শ্মশান-বাসিনীকে বলিল, "শ্মশান-বাসিনী! বেলা হয় যে।" শ্মশান-বাসিনী বলিল, "যাইতেছি," সন্ন্যাসীকে বলিল, "বাবা! আমি তবে পুঁটীকে লইয়া যাইব।" শ্মশান-বাসিনী একটি নকুল শিশু প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহাকে পুঁটী বলিয়া ডাকিত। সে পুঁটীকে কোলে তুলিয়া সন্ন্যাসীর অনুমতির অপেক্ষায় তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসীর বদন গম্ভীর হইল, তিনি কহিলেন, যাও মা,—যাহা যাহা আবশ্যক হয়, লইয়া যাও।" এতক্ষণে শ্মশান বাসিনীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, সত্য সত্যই তাহাকে এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সন্ন্যাসীর পদে প্রণাম করিল, সেই সময়ে তাহার পৃষ্ঠ দেশের বস্ত্র কিঞ্চিৎ সরিয়া গেল, হঠাৎ সন্ন্যাসীর সেইদিকে দৃষ্টি পড়িল, শ্মশান-বাসিনী মস্তক তুলিতে যায়,— ত্রাস্তভাবে সন্ন্যাসী বলিলেন, "দেখি মা দেখি, আর একবার তুমি মাথা হেঁট কর ত।" শ্মশান-বাসিনী পুনর্ব্বার মস্তক নত করিল। সন্ন্যাসী তাহার পৃষ্ঠের কি একটী চিহ্ন অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্মিতের ন্যায় দেখিয়া বলিলেন, "বিপ্রদাস! শ্মশান-বাসিনীকে পরিত্যাগ করা হইবে না, এদিকে আইস।" বিপ্রদাস নিকটে গেল। সন্ন্যাসী শ্মশান-বাসিনীর পৃষ্ঠের কোনও একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন, বালিকা বড়ই সুলক্ষণসম্পন্না। পৃষ্ঠদেশে এই প্রকার চিহ্ন থাকিলে পুরুষ রাজা এবং রমণী হইলে রাজ্ঞী হয়। শ্মশান-বাসিনী রাজ্ঞী অথবা অতুল ধনের অধিশ্বরী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিও। চেষ্টা করিয়া ইহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিও না, ইহার যাহাকে ইচ্ছা হইবে, আপন ইচ্ছায় তাহাকে বরণ করিবে; তাহাতে প্রতিযোগী হইও না।

আর তুমি যে সকল বস্তু সংগ্রহের জন্য এতকাল ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছ, তাহা শ্মশান-বাসিনী হইতেই প্রাপ্ত হইবে। শ্মশান-বাসিনী সম্বন্ধীয় নানা কথায় দিবস অতিবাহিত হইল, রজনীতে প্রত্যহ যেরূপ সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া যান, সে-দিনও রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গেলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। বিপ্রদাস সুরেন্দ্র এবং শ্মশান-বাসিনী উদ্বিগ্ন হইল, অনেক অনু-সন্ধান করিল, কোথাও সাক্ষাৎ পাইল না। আজ আসিলেন না, কাল আসিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া চারি বৎসর গত হইল, সন্ন্যাসী আর ফিরিলেন না। কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসী কোথায় গমন করিলেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বহুদিন যে আশায় রাখিয়াছি প্রাণ,
পূরিবে কি সেই আশা যাহা ধ্যান জ্ঞান।

আশালতা।

কালধর্ম্মে এখন আর শ্মশান-বাসিনী বালিকা নহে—বলিতে হইলে প্রকৃতপক্ষে—নবযুবতী। সুবিমল চন্দ্রাতপের ন্যায়—সন্ধ্যা রাগ-রঞ্জিত বাসন্তীলতিকার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভমানা সব বিক-সিত নলিনীর ন্যায় প্রফুল্ল। শারদীয় সলিল-শোভনা স্নিগ্ধ কৌমুদী-বসনা কমল-ভূষণা সরসীর ন্যায় রূপরাশি ঢল ঢল করিতেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই নবভাবে মধুরতায় পূর্ণ।

আজ বৈশাখ মাসে—দিবা প্রায় অপরাহ্ণ। ভয়ানক গ্রীষ্ম, গৃহে তিষ্ঠান ভার—বাতাসের লেশমাত্র নাই—গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। গরমে প্রাণ আন চান্ করিতেছে, দেহে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছে। শ্মশান-বাসিনী গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রম নিবারণার্থে আশ্রমের বাহিরে একটি তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল। ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, বসনাঞ্চলের দ্বারায় কখন ব্যজন করিতেছে। হঠাৎ বনের দিকে কি একটা বিকট শব্দ শুনিয়া শ্মশান-বাসিনী চকিত নয়নে সেই দিকে চাহিল; দেখিল একটী সশস্ত্র যুবাপুরুষ আশ্রমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী, বিপ্রদাস এবং সুরেন্দ্র ব্যতীত শ্মশান বাসিনী নবজীবনে অন্য আর কোন পুরুষকে দেখে নাই। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া যেন বিস্মিত হইল। যুবক নিমেষ মধ্যে তাহার নিকটে আসিয়া "ওগো আমায় রক্ষা কর, আমি শরণাগত" বলিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ ভয়াকুলনেত্রে পশ্চাৎদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি হইয়াছে গা?" যুবক ভীত ও কম্পিত স্বরে বলিল, "ওগো, আমি বড় বিপন্ন—আমাকে রক্ষা কর, পরে বলিব; এখন আমাকে শীঘ্র একটু লুকাইবার স্থান দেখাইয়া দাও।" "আইস" বলিয়া শ্মশান-বাসিনী তৎপর হইয়া তাহাকে কুটীর মধ্যে লইয়া গেল। সম্প্রতি যুবকের প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ভয়জনিত কম্প থামিল না। "ভয় নাই, রক্ষা করিব, নিশ্চিন্তে অবস্থান কর" বলিয়া শ্মশান-বাসিনী কুটীর মধ্যে হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, দেখিল সম্মুখে বিপ্রদাস,—অতি ভয়ঙ্কর বেশ। এখন আর কটিতে বল্কল নাই, গলে রুদ্রাক্ষ মালা নাই, শিরে জটাভার নাই। বিপ্রদাসের এখন রণবীর যোদ্ধ্‌বেশ।

বর্ম্মাবৃতদেহ, ললাটদেশে ঘর্ম্মস্রোত বহিতেছে, করস্থ সুদীর্ঘ সুশাণিত তরবারি রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছে, শুভ্র উষ্ণীষে বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগিয়াছে। আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কোথায় সে প্রশান্ত মূর্ত্তি আর কোথায় বা সে নম্রভাব! সেই সুবিশাল বক্ষ যেন এখন আরও বিস্তীর্ণ। সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় যেন আরও দীর্ঘ! স্ফূর্ত্তি যুক্ত দেহ যেন ক্রোধোদ্দীপ্ত অগ্নির ন্যায়! সহসা একি মূর্ত্তি!

পূর্ব্বোক্ত যুবককে শ্মশান-বাসিনীর কুটীরে লুকাইয়া রাখিল, বিপ্রদাস তাহা দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় অতি ভীমবেগে শ্মশান-বাসিনীর সম্মুখীন হইয়া কুটীরে প্রবেশ করিতে যান, এমন সময় শ্মশান-বাসিনী দুই হস্তে দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি হইবে?" শ্মশান-বাসিনীর বাক্য শুনিয়া বিপ্রদাস স্তম্ভিত হইল, তাহার হস্ত হইতে তরবার স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। "ছিঃ শ্মশান-বাসিনী! তুমি আজ সব নষ্ট করিলে" বলিয়া শ্মশান-বাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। শ্মশান-বাসিনী উত্তর করিল, "কি নষ্ট করিলাম, বিপ্রদাদা! তবে যদি তোমার এরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকে যে শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া শ্মশান-বাসিনী একটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তবে ভগিনী বলিয়া তাহা ক্ষমা কর। সে ইচ্ছা তুমি ভুলিয়া যাও। আর যদি উহার জীবনের বিনিময়ে আমার এই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া তোমার ক্রোধের শান্তি হয়, তাহাও সচ্ছন্দে তুমি লইতে পার। আমার তাতে কোন দুঃখ নাই।"

বিপ্রদাস। শ্মশান-বাসিনী! যখন গুরুর সমক্ষে বলিয়াছি, শ্মশান-বাসিনীর কোনও কার্য্যে আমি বিঘ্ন প্রদান করিব না, তখন তোমার কার্য্য আমার সম্পূর্ণ অপ্রিয় হইলেও তাহা প্রিয় জ্ঞান

করিব, কিন্তু যাহাকে আশ্রয় দিয়াছ, সে ব্যক্তি শত্রু কি মিত্র তাহা জানিলে না, শুনিলে না, তাহার জন্য এতদূর প্রাণপণ। তুমি বালিকা, তোমার সরল মন সকলেই তুমি সরলময় জান, কিন্তু তা নয় শ্মশান-বাসিনী।

শ্মশান-বাসিনী। যাহাই হউক, যাহাকে অভয় দিয়াছি, আর কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিব বিপ্র-দাদা?

বিপ্রদাস শ্মশান-বাসিনীর বাক্যে কোনও উত্তর না দিয়া সেই কুটীর মধ্যস্থিত লুকায়িত যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখরে অধর্ম্মাচারী যবন, দেখ—শরণাগতের রক্ষার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিরূপ আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, বালিকা শ্মশান-বাসিনীর নিকটে তাহা তুই শিক্ষা কর। আর লুকাইয়া কেন। তুই যখন বজ্রপাত নিবারণের জন্য কমলদলের অন্তরালে লুকাইতে লজ্জা বোধ করিস্ নাই, তখন তোর জীবন ত নিতান্ত অপদার্থ। তোকে বিনষ্ট করিয়া আর হস্ত কলঙ্কিত করি না, তাহাতে মহা পাপ অর্শিবে—নির্ভয়ে প্রস্থান কর। গৃহস্থিত যুবক লজ্জাবনত মুখে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মৃদুগমনে দূর বনমধ্যে প্রস্থান করিল। প্রস্থান কালে তাহার শিরোশোভা উষ্ণীষ হইতে একখানি কাগজ প্রাঙ্গনে পড়িয়া গেল, বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি গিয়া সেখানি কুড়াইয়া লইল, দেখিল, তাহা একখানি পত্র। একাগ্রমনে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় গণিমিঞা! তোমার পত্র পাইলাম। জেনানার নাম রজনী নহে—মেঘাবতী। তবে সেখানে যদি রজনী নাম ধরিয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না। আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধানে

জানিয়াছি, বর্দ্ধমানের নিকট হেঁপো নামক একটা প্রকাণ্ড বিলের দক্ষিণ যে বিস্তৃত জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলে তাহার আড্ডা। আমাকে শাস্তি দিবার জন্য কৌশলে অনেক দস্যুকে বশীভূত করিয়াছে। দস্যুগণ তাহাকে ঈশ্বরী জ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, ডাকাতি করিয়া তাহাকে নিত্য ভূরি ভূরি অর্থ আনিয়া দেয়। সে যে শীঘ্রই একটা বিষম হাঙ্গামা বাধাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল কথা সত্য কি না অগ্রে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিও—সাবধান! যেন তোমাকে আদৌ মুসলমান বলিয়া জানিতে না পারে। তাহাদিগের দলে একবার মিশিতে পারিলে শীঘ্রই সকল কার্য্য সাধন হইবে লিখিয়াছ, মিশিতে পারিলে তাহা সত্য বটে, দেখিও অসাবধান বশতঃ কোন সময়ে মুখ দিয়া কদাচ যেন যাবনিক ভাষা উচ্চারিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। সে যদি সত্যই মেধাবতী হয়, তবে তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে এ সংবাদ দিও। তোমার সত্বর গমনাগমনের জন্য স্থানে স্থানে আমি দ্রুতগামী অশ্ব সজ্জিত করিয়া রাখিব। গণিমিঞা! অধিক আর কি লিখিব, এ করিম খাঁর জীবন সর্ব্বস্ব এক দিকে,—মেধাবতী এক দিকে, এই বিবেচনা করিয়া তুমি কার্য্য করিবে। আর এক কথা, সে জেনানা বড়ই বুদ্ধিমতী, তাহা প্রথম সাক্ষাতেই পরিচয় পাইয়াছ ইহাও স্মরণ রাখিবে, অধিক লেখা বাহুল্য। পত্রখানি পাঠ করিয়া তদ্দণ্ডেই অগ্নিতে দগ্ধ করিবে ইতি।

বশম্বদ

সেখ করিম খাঁ।

নবাবগঞ্জ।

পত্রখানি পাঠ করিয়া বিপ্রদাসের প্রশান্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া আবার প্রফুল্ল হইল। শ্মশান-বাসিনী বুঝিল বিপ্রদাদার বুঝি রাগ পড়িয়াছে, জিজ্ঞাসিল, "সে কি বিপ্রদাদা" বিপ্রদাস উত্তর দিল না—কি ভাবিতেছে। শ্মশান বাসিনী আবার বলিল, "ও কিসের কাগজ?" বিপ্রদাস অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর করিল,—"এ্যাঁ কি বলিতেছ—কাগজ!—এখানা—দরকারী কাগজ। সুরেন্দ্র-কোথায়?"

শ্মশান। ফল আনিতে গেছে—কেন?

বিপ্রদাস। প্রয়োজন আছে।

শ্মশান। ডাকিয়া আনিব?

বিপ্রদাস। আন।

শ্মশান-বাসিনী ডাকিতে যাইতেছে, বিপ্রদাস ডাকিল "কোথা যাও?"

শ্মশান। এখনি যে সুরেন দাদাকে ডাকিতে বলিলে।

বিপ্রদাস। না না তোমাকে ডাকিতে হইবে না, এখনি আপনি আসিবে।

শ্মশান-বাসিনী ফিরিল,—সুরেন্দ্রও আসিয়া পঁহুছিল। বিপ্রদাসের বীরবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "এ আবার তোমার কি বেশ?"

বিপ্রদাস। কাছে আইস বলিতেছি।

সুরেন্দ্র নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল "বিষয় বড় বিষম গুরুতর, এখন সত্বর তোমাকে এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

ব্যাপার যে বড় গুরুতর, তাহা বিপ্রদাসের বেশভূষা দেখিয়াই সুরেন্দ্র বুঝিয়াছিল, কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিল "কেন বলুন দেখি।"

বিপ্রদাস। বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে।

সুরেন্দ্র। কি বিপদ?

বিপ্রদাস। পরে বলিব।

সুরেন্দ্র। আপনি এখন কোথায় যাইবেন?

বিপ্রদাস। আমি এই জেলার মধ্যেই থাকিব, কিন্তু অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে, সময়ে সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

সুরেন্দ্র। সেরূপ ভাবে কত দিন থাকিতে হইবে?

বিপ্রদাস। যতদিন না কার্য্যোদ্ধার করিতে পারি—যতদিন আশালতা শ্রীমতী না হয়।

সুরেন্দ্র। আমাকে কবে যাইতে হইবে?

বিপ্রদাস। আজই। ঘোর শত্রুতে সন্ধান পাইয়াছে।

সুরেন্দ্র শ্মশান-বাসিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। বিপ্রদাস বলিল "শ্মশান-বাসিনীকেও তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। তবে যুবতী কে—এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে"—বিপ্রদাসের কথা বাধিয়া গেল।

সুরেন্দ্র। তখন কি বলিব?

বিপ্রদাস একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "গুরুদেবের আদেশ অন্যরূপ তাহা না হইলে সে পরিচয় দিবার ভাবনা ছিল না, শ্মশান-বাসিনীকে বিবাহ করিলেই সব গোল মিটিয়া যাইত।" বিপ্রদাস একথা বলিতে সাহস করিত না, সে বুঝিয়াছিল তাহাদিগের পরস্পরের যথেষ্ট অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে। শ্মশান বাসিনী সুরেন্দ্রকে সর্ব্বদা দেখিতে ভাল বাসে, সুযোগ পাইলে তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, কোথাও গমন করিলে উৎকণ্ঠিত হয়, আসিতে বিলম্ব হইলে চঞ্চল নয়নে পথপানে চাহিয়া থাকে। ইহাতে অন্যে যাহাই ভাবুন, বিপ্রদাস যাহাই

বুঝুন, কিন্তু সে চাহনি—সে উৎকণ্ঠা অতি পবিত্র সরলতায় পরিপূর্ণ। শ্মশান-বাসিনীর নির্ম্মল হৃদয়ের ভাব সকলেই বুঝিতে পারে, নির্ম্মল জলের বস্তু সকলেই দেখিতে পায়। যতক্ষণ হৃদয় কুটিল—অথবা শরীর পঙ্কিল না হয়, ততক্ষণ কিছুই গোপন করিতে পারে না। সে ভালবাসা গোপনে রাখিতে জানিত না। সুরেন্দ্র তাহাকে দেখিতে ভাল বাসিতে, কিন্তু কাহারও সাক্ষাতে তাহার মুখপানে চাহিতে পারিত না, তাহার সহিত কথা কহিতেও ভরসা করিত না কিন্তু বিপ্রদাস থাকিলে কেমন কেমন বোধ বাধ ঠেকিত, কেন—এখনি যদি দেখিয়া ফেলে, কি কিছু মন্দ বুঝেন, তাহা হইলে হয়ত অনিষ্ট ঘটিবে। বিপ্রদাস চতুর, তাহার কাছে সুরেন্দ্রের চতুরতা খাটিত না।

শ্মশান-বাসিনী তাহাদের মুখেই শুনিয়াছিল, বিবাহ বলিয়া একটা কথা আছে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া বিবাহ হয়—বিবাহের অর্থ কিছুই বুঝিত না। অম্লান বদনে সে বলিয়া ফেলিল "যদি আমাকে সুরেন্দ্রের সহিত যাইতে হয়, আর পরিচয় দিবার কোনও উপায় না থাকে, তবে আমাদের বিবাহই হউক না কেন?" শ্মশান বাসিনার কথায় বিপ্রদাস একটু হাসিল, সুরেন্দ্র মস্তকটি নত করিল। শ্মশান-বাসিনী আবার বলিল "বাবা বলিয়াছিলেন যাহাকে ইচ্ছা হইবে তাহাকেই বিবাহ করিব—আমি সুরেন্দ্রকেই বিবাহ করিব। বিপ্রদাস, "তাহাই করিও" বলিয়া সুরেন্দ্রকে বলিল "সুরেন্দ্র! শ্মশান-বাসিনী যখন তোমাকে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তখন তোমার বিবাহ করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে গুরুদেবের আদেশ কোনরূপে লঙ্ঘন করা হইবে না।" সুরেন্দ্র শ্মশান-বাসিনীকে যদিও মনে

ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রণয় লাভের আশা মনে করিত না। আবার বিবাহ করিব,—আবার যে সংসারী হইব, ইহা ক্ষণমাত্রও মনে ভাবিত না,—তবে যে শ্মশান-বাসিনীকে সময় পাইলে এক আধ বার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইত—তাহার সে ভাব অন্যরূপ। দেখিত—তাহার সুন্দর ছবিখানি—সুন্দর চাহনিটী—সুন্দর স্বভাবটী। স্থির স্বচ্ছ সলিলে চাঁদের ছায়া ভাসিতেছিল, এতদিন কোনক্রমে টলে নাই, আজ সলিল টলিয়া উঠিল, চাঁদের ছায়া দেখিতে লাগিল। কি বলিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির হইল না। বিপ্রদাস পুনর্ব্বার বলিল, "যদি শ্মশান-বাসিনীর জাতি বিচারের প্রয়োজন হয়, তবে আমি বলিতেছি উহার যেরূপ পবিত্র মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে ও কথনই নীচকুল সম্ভূতা নহে। প্রয়োজন হইলে নীচকুল হইতেও কন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

সুরেন্দ্র। আমায় এরূপ আদেশ করিতেছেন কেন?

বিপ্রদাস। শ্মশান-বাসিনীকে রক্ষা করিবার জন্য! গুরুদেব পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আমরাও পরিত্যাগ করিলে এমন স্বর্ণলতা আর কার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে, তাহাতে কি হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না। আর তোমারই কি সংসার পরিত্যাগের এই উপযুক্ত সময়! সুরেন্দ্র কথা কহিল না, বিপ্রদাস কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া বলিল, "যদি প্রস্তাবে সম্মত না হও তবে শ্মশান-বাসিনীকে কি করিব বলিয়া দাও! সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল "ভাল আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য তাহাই হইবে।"

বিপ্রদাস। হইবে নহে, সে কার্য্য এখনি সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাও।

সেই দিন সুরেন্দ্র শ্মশান-বাসিনীকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া সন্ধ্যাকালে হর্ষ ও বিষাদে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিল। বিপ্রদাস সুরেন্দ্রকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল। তবে বিপ্রদাস প্রত্যাগমন কালে একবার স্নেহলতা শ্মশান-বাসিনীর মুখপানে চাহিল, জিতেন্দ্রিয়েরও সেইকালে চক্ষু ফাটিয়া একবিন্দু অশ্রু ভূমিতলে পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংসার-সাগরনীরে সতত তুফান,
জীবগণ যাহে পড়ি ব্যাকুলিত প্রাণ।

ক্ষণপ্রভা প্রকাশ।

মনের আশা বহুদূর, দেখিয়া থাকুন সে আশা সম্পূরণ হয় কি না।

পাঠক মহাশয়! এইবার আপনাকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করি। উপন্যাস পটে যে সকল চিত্রগুলি দেখিয়া আসিলেন, এইস্থানে তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় দিব। উপন্যাসের প্রায় অর্দ্ধেক ফুরাইল, এ পর্য্যন্ত রজনী, বিপ্রদাস, শ্মশান-বাসিনী বা মুসলমানবীরের বিশেষ পরিচয় পাইলেন না, ইহাতে হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন, কি হইয়াছেন। যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন ক্ষমা করিবেন—ধৈর্য্য ধরিবেন। লেখকের জয় হইবেই। লেখক পাঠককে হাঁসাইতে নাচাইতে বা কাঁদাইতে চেষ্টা করে, সে চেষ্টা সফল করিবেই। আপনি গণিনিঞা এবং করিম খাঁর ঘোর অত্যাচারে না ক্রুদ্ধ হয়েন, রজনীর চতুরতার

না হাসেন, শ্মশান-বাসিনী এবং শরতের দুঃখে না কাঁদেন বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারেন, পাগলের কথা বলিয়া হাসিয়া উঠিতে পারেন, সাহিত্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতে পারেন। যে দিকেই যাইবেন লেখকের জয় অনিবার্য্য এখন আসুন সবিশেষ পরিচয় দিব, এতক্ষণ দিই নাই কেন— উপন্যাস আর ইক্ষু এই দুটী বস্তুর গোড়া হইতে আরম্ভ না করিয়া শেষ হইতে গোড়ায় আসিলে শেষে ঠকিতে হয় না, সেই জন্য গোড়া রাখিয়া আগার কথাটা আগেই বলিতে ছিলাম—এখন গোড়ার কথাই বলিব।

নবাবগঞ্জের বিশ্বম্ভর সিংহের দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠা মেধাবতী, কনিষ্ঠা ভোগবতী। মনোহারির ভূপাল সিংহের সহিত মেধাবতীর বিবাহ হয়। মেধাবতী পূর্ণ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। কনিষ্ঠা ভোগবতীর বয়স দশবৎসর। বিশ্বম্ভরসিংহ একজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার, নগদ সম্পত্তিও অনেক। একদিন তিনি নিজের বৈঠক খানায় বসিয়া জমীদারী কাগজ পত্র দেখিতেছেন, নিকটে দুই একজন আমলা ও অনেকগুলি প্রজা বসিয়া আছে, হঠাৎ একটা লোক আসিয়া বিশ্বম্ভরের হস্তে একখানি পত্র দিল। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসিল, "কে পাঠাইয়াছে ?"

পত্রবাহক। পাঠ করিলেই পত্রের মর্ম্ম জানিতে পারিবেন।

বিশ্বম্ভর পত্র বাহকের অযোগ্য উত্তরে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া একবার তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

পত্রখানি করিম খাঁর। করিম খাঁ একজন ধনাঢ্য মুসলমান, বয়স প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল বিশ্বম্ভর সিংহের জ্যেষ্ঠ কন্যা মেধাবতী অতিশয় রূপবতী, যুবতী এবং বুদ্ধিমতি। মেধাবতীকে বিবাহ করিবার আশায়

প্রথমতঃ তাঁহাকেই একখানি গোপনে পত্র লিখিল। কোন বাতুলে লিখিয়াছে বলিয়া মেঘাবতী সে পত্রখান স্বেচ্ছায় ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহার আর কোনও উচ্চ্যবাচ্য করিল না বা কাহাকেও সে কথা বলিল না।

সাত আট দিন হইল, করিম খাঁ যখন মেঘাবতীর নিকট কোনও উত্তর পাইল না, তখন প্রকাশ্যভাবে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। সে পত্র অগ্রে এক জন বৃদ্ধ আমলার হস্তে পতিত হয়, তিনি তাহা বিশ্বম্ভরকে দেখাইতে সাহস করেন নাই, করিম খাঁ এ পত্রেরও যখন উত্তর পাইল না, তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এই শেষ পত্র লিখিয়াছে। পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই,—আমি মেঘাবতীর পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও উত্তর পাই নাই। এই জন্য পুনর্ব্বার লিখিতেছি, করিম খাঁকে মেঘাবতী সম্প্রদান সম্বন্ধে কদাচ অন্যমত করিবেন না। যদিও হিন্দুধর্ম্ম মতে তাহার বিবাহ হইয়াছে, এক্ষণে তাহা ফিরাইয়া লউন। ইহা আপনার ও মেঘাবতীর সৌভাগ্য মনে করিয়া এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন এবং সত্বর পত্রের উত্তর দিবেন, অন্যথা করিলে সদলে উপস্থিত হইয়া মেঘাবতীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিব। পত্র পাঠ করিয়া বিশ্বম্ভর সিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল, ললাট ঘামিয়া উঠিল, হস্ত পদ থর থর কাঁপিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রোধপূর্ণ কর্কশ স্বরে পত্র বাহককে বলিল, "যাও শূয়ার কো জল্‌দি ভেজ দেও" পত্র বাহক দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পত্র আর কেহই দেখিতে পাইল না বা কথারও অর্থ বুঝিল ,না।

জিজ্ঞাসা করিতেও কাহারও সাহস হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কাছারী ভাঙ্গিয়া গেল, বিশ্বম্ভর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মেধাবতীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "মা তোমার আর এখানে থাকা হইবে না, কালই তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও।" মেধাবতী এ কথার মর্ম্ম বুঝিল কি না বুঝিল তাহা ঈশ্বর জানেন, পিতাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

সেই দিন গভীর রাত্রিতে বিশ্বম্ভরের বাটীতে ডাকাত পড়িল, বাড়ীর প্রাঙ্গনে হৈ হৈ শব্দ উঠিল। বিশ্বম্ভর সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন ডাকাইত আর কেহ নহে—করিম খাঁ। সে যে একটা অচিরেই বিষম হাঙ্গামা উপস্থিত করিবে তাহা সেই পত্র পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আজই যে করিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে বিশেষ সতর্ক হইতেন। পাপীষ্ঠ যবনের চাতুরী বুঝিয়া ওঠা বিষম ব্যাপার? যখন তাহারা বাড়ী ঘেরিয়াছে, উঠানে পড়িয়াছে তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা পুরুষের কার্য্য নহে ভাবিয়া একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া স্বয়ং তাহাদের সম্মুখীন হইল। বিশ্বম্ভর জাতীতে ক্ষত্রিয়, তলওয়ার খেলাও রীতিমত জানিতেন, কিন্তু তত লোকের মধ্যে তাঁহার বীরত্ব খাটিল না। গত রাত্রেই তাহাদের অসির আঘাতে ধরাশায়ী হইলেন।

গোলমাল শুনিয়া মেধাবতী কনিষ্ঠা ভগিনী ভোগবতীকে লইয়া ছাদে উঠিল, দেখিল বাটীর চারিদিকে অগণ্য অশ্বারোহী সিপাহি দণ্ডায়মান। বুঝিল পাপীষ্ঠ যবন হইতেই এ অনর্থ ঘটিয়াছে। পতিপ্রাণা মেধাবতী সে সকল কথা একপ্রকার ভুলিয়া যায়, হঠাৎ এই উপদ্রব দেখিয়া সেই পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণ হইল। ভোগবতীকে বলিল, "ভগ্নি! দেখছিস কত লোক।"

ভোগবতী। দেখিয়াছি, অত লোক কেন দিদি?

মেঘাবতী। উহারা সব ডাকাত, আমাদের বাড়ী ঘিরিয়াছে জন কতক প্রবেশ করিয়াছে—এইবার হয়ত আমাদের কপাট ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিবে।

ভোগবতী। নীচে ত বাবা আছেন, উহাদিকে তাড়াইয়া দিক না।

মেঘাবতী। বাবা বোধ হয় একা পারেন নাই।

ভোগবতী। দিদি এখন তবে কি করিতে চাও?

মেঘাবতী। পলাইতে চাই।

ভোগবতী। অত লোকের সম্মুখ দিয়া কেমন করিয়া পলাইবে? পলাইতে গেলে উহারা আমাদের ধরিয়া ফেলিবে।

মেঘাবতী। তাইত ভাবিতেছি—আমি যদিও পারিতাম, তুই কি পারিবি? তোকে লইয়া যাওয়াই শক্ত!

ভোগবতী। দিদি তুমি কেমন করিয়া পলাইবে?

মেঘাবতী। কাপড় গুটাইয়া আলিসায় বাঁধিব তাহাই ধরিয়া নীচে নামিব।

ভোগবতী। চারিদিকেই যে লোক কোন দিকে নামিবে?

মেঘাবতী। খিড়কীর দিকে—ও দিকটায় বড় লোক নাই।

ভোগবতী। দিদি তুমি যদি সাহস কর, তবে আমি কাপড় ধরিয়া নীচে নামিতে পারিব।

মেঘাবতী একবার স্থিরকর্ণে শুনিল নীচের ঘরে দুমদাম শব্দ হইতেছে, বলিল "ভোগবতী! শোন তাহারা সিঁড়ির দরজা ভাঙ্গিতেছে, দরজা যদিও বন্ধ করিয়াছি ওরূপ আঘাতে কতক্ষণ টিকিবে—দরজা ভাঙ্গিলেই আমাদের বিপদ। নামিতে পারবি ত না পারিলে উভয়েরই প্রাণ যাইবে। রক্ষা পাইব না।

ভোগবতী। তুমি কোন চিন্তা করিও না—নামিতে পারিব। চল।

মেঘাবতীর সাহস হইল। সে গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি কতকগুলি বস্ত্র আনিয়া শীঘ্র হস্তে তাহা গুটাইয়া লইল, পরে ছাদের আলিসায় বাঁধিয়া অগ্রে ভোগবতীকে নামিতে বলিল, ভোগবতী অনায়াসে নামিতে পড়িল। শেষে মেঘাবতীও নামিল।

তাহাদিগের বাটির অনতিদূরে গণিমিঞা নামক একজন মুসলমান মেঘাবতীর পিতার বিশ্বাসী বন্ধু ছিল। বিশ্বম্ভর সিংহ তাহাকে অনেক সময়ে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, মেঘাবতী সেই সাহসে চুপি চুপি গিয়া গণিমিঞার শরণ হইল! সেও অভয় দিয়া সান্ত্বনা করিল।

সে রাত্রি বিশেষ ভয়ের সহিত সেই ভাবেই কাটিল; লোকমুখে মেঘাবতী শুনিল শত্রুতে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। সে নিজে ধরা পড়িবার ভয়ে আর বাটী যাইতে সাহস করিল না, জ্ঞাতিগণেই তাহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সমস্ত সম্পন্ন করিল, মেঘাবতী ভোগবতী মনে মনেই কাঁদিল।

মেঘাবতীর এখনও অন্তরের ভয় দূর হয় নাই। হয়ত দুষ্ট সন্ধান করিয়া এখানেও আসিবে, আশাতীত উৎকোচ প্রদান করিয়া গণিমিঞা দ্বারায় আমাকে ধরাইয়া লইবে, এই কথা সর্ব্বদা ভোগবতীর সহিত আলোচনা করে। গণিমিঞা যদিও তাহার পিতার বিশ্বাসী, তত্রাচ মেঘাবতীর যেন ভাল বিশ্বাস হইতেছে না। মেঘাবতী সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকিতে হইয়াছে।

গণিমিঞার বৈঠকখানাটী অন্তঃপুরের সহিত সংলগ্ন, মধ্যে একটী প্রাচীর মাত্র ব্যবধান। সেই দিকে একটী জানালা আছে, জানালা খুলিলে বৈঠকখানার ভিতরটী বেশ দেখা যায়,

মনোযোগ দিয়া শুনিলে কথোপকথনও শুনা যাইতে পারে। এক দিন সেই বৈঠকখানার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে যে সকল কথা হইতেছে, শুনিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিল। জ্ঞান চৈতন্য লোপ পাইল।

গণিমিঞা কাহাকে বলিল, "সে আশা আপনি ছাড়িয়া দিন। যখন আমি তাহাকে অভয় দিয়াছি তখন আর সে কার্য্য করিতে পারিব না।" উত্তর হইল "আশার অতীত অর্থ লও।"

গণিমিঞা। তাহা আমি পারিব না। উহার অপেক্ষাও রূপবতী যুবতী তোমায় আনিয়া দিব—আপনি উহার আশা করিবেন না।

উত্তর। এ জীবনে মেধাবতীর আশা ছাড়িব না। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া তাহাকে এইক্ষণে বাহির করিয়া দাও।

গণিমিঞা কিয়ৎকাল ভাবিয়া বলিল, "এত সামান্য অর্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।"

উত্তর। ভাল এক লক্ষ দিব,—আরও চাহ আরও দিব—প্রাণ দিব—যথা সর্ব্বস্ব দিব—তবু কি তুমি দয়া করিবে না।

গণিমিঞার মন এতক্ষণে নরম হইল, বলিল, "আমি যখন তাহাকে বলিয়াছি আমার নিকট কোন ভয় নাই, তখন আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে পারিব না। আপনি সে দিবস তাহার বাটীতে যেরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমার বাটীতেও সেইরূপ করিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমি নির্দ্দোষী বলিয়া জন সমাজে পরিচয় দিতে পারিব।"

উত্তর। উত্তম। অতি উত্তম কথা আজই রাত্রিতে আপনার বাড়ী ঘেরাও করিব।

উভয়ের এই সকল কথোপকথন শুনিয়া মেঘাবতীর সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল, পলাইবার ইচ্ছায় এক-বার খিড়্কির দিকে ছুটিয়া গেল; দেখিল, সে দরজায় চাবি। চাবি ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিল, তাহা পারিল না, তখন পুনর্ব্বার গৃহ মধ্যে আসিয়া মনে মনে পরম পিতা জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। সে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় হইয়াছে, কোনরূপে পলাইবার উপায় নাই, আজ চারিধারেই শত্রু সিপাহী। একবার ভাবিল, না হয় গণি মিঞার স্ত্রীর শরণাপন্ন হই, আবার ভাবিল, না—আর অধিক জানাজানি করিব না—ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে। যদি উপায় করিতে পারি পলাইব, না পারি ছাদ হইতে পড়িয়া মরিব। কিন্তু আর কোন বুদ্ধিই খাটিল না। যেমন সন্ধ্যা হইল, অমনি তাহারা পূর্ব্বমত আসিয়া বাটী ঘিরিল।

মেঘাবতী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিল। একব্যক্তি আসিয়া সজোরে দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "জেনানা! কেওয়ারি খুল জল্‌দি।"

মেঘাবতী। মহাশয় আপনি কে?

উত্তর। কপাট খুলিলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।

মেঘাবতী। আপনি কে না বলিলে আমি কপাট খুলিব না।

উত্তর খুলিবে না! সগর্ব্বে এই কথা বলিল।

মেঘাবতী এক্ষণে অনন্যোপায়—আজ আর রক্ষা নাই। যাহার শরণাগত হইয়াছে, সেই যখন তাহাকে ধরাইয়া দিতেছে। কপাটের নিকটে আসিয়া বলিল, "এত করিয়াও তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না, ছি! এই লও কপাট খুলিয়া দিলাম।" মেঘাবতী নির্ভয়ে দরজা খুলিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইল।

লোকটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, কেন—কেন—কি হইল এত ভৎ'সনা কেন? অপরাধটা কি?

মেঘাবতী। তোমাকে বলিব না, তোমাদিগের যিনি সর্দ্দার তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।

উত্তর। খোদার কৃপায় আমিই সেই—আমারই নাম করিম খাঁ। মেঘাবতী যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা! আপনি সেই রসিকপ্রবর করিম খাঁ? না—আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি তিনি অতি বুদ্ধিমান—গুণবান—বিজ্ঞ—রসজ্ঞ। আপনার ত তাহার কিছুই দেখি না।"

করিম। কেন, আমি কি অন্যায় কার্য্য করিলাম?

মেঘাবতী। এইরূপ বুঝি আপনার গুপ্ত প্রণয়?

করিম। গুপ্ত প্রণয় নহে, তোমাকে ইচ্ছাক্রমে বিবাহ করিব।

মেঘাবতী। উত্তম—সেত এ দাসীর সৌভাগ্য—কেবল আমাকে কেন, আপনি সহস্র সহস্র বিবাহ করিতে পারেন কিন্তু আমরা হিন্দুমহিলা, আমাদিগকে ত একটীর অধিক বিবাহ করিতে নাই, কাজেই এরূপ বিবাহকে আমাদের হিন্দুরা গুপ্ত-প্রণয় বলে। আপনি আমার সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় করুন।

করিম। বেশ! বেশ! আজ হইতে গুপ্ত-প্রণয় হইল—তাহাতে দোষ কি?

মেঘাবতী। গুপ্ত-প্রণয় হইলে কি এরূপ ঢাক বাজাইতে হয়? যদি আপনার সেই অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকে গোপনে বলাই ত উচিত ছিল।

করিম। আমি পত্র লিখিয়াছিলাম—তাহা কি তবে তুমি পাও নাই?

মেঘাবতী। পাইয়াছিলাম বই কি।

করিম। তবে উত্তর দাও নাই কেন?

মেঘাবতী। যদি উত্তরই পাইলেন না ইহাতে ত বুঝা উচিত ছিল, মৌন, সম্মতির লক্ষণ।

করিম। ঠিক—আমার সেটা বড় ভুল হইয়াছিল।

মেঘাবতী। আপনি একবার ভিতরে আসুন।

করিম ভিতরে গিয়া মেঘাবতী যে পর্য্যাঙ্কখানিতে বসিয়াছিল, তাহাতে গিয়া বসিতে গেল—মেঘাবতী আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

করিম। প্রাণাধিকে! তুমি দাঁড়াইলে কেন—তুমি আমার নিকট বৈস।

মেঘাবতী। খাঁ সাহেব! প্রভুর সহিত দাসী একাসনে বসিবে কিরূপে? আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ।

করিম। ঠিক প্রিয়ে, ঠিক! ধন্য তোমার পতি ভক্তি!

সমুদ্র সেঁচিয়ে রতন পেয়েছি,
গলাতে পরিব গেঁথে।

মেঘাবতী দেখিল এখন বিশেষ কায়দায় পড়িয়াছি, উহার আনুগত্য স্বীকার ভিন্ন অন্য উপায় নাই, একটু কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিল,—

"আজীবন তরে বিকাইনু পায়
দিব না অন্যত্রে যেতে॥"

করিম। মেঘাবতীর ঈষৎ হাস্য জড়িত মিষ্ট কথায় গলিয়া গেল। বলিল, "যদি মনে মনে সব বুঝিয়াছিলে করিম খাঁকে এত অনুগ্রহ করিবে, তবে এত কষ্ট দিলে কেন?"

মেঘাবতী। আপনাকে পরীক্ষা করিলাম।

করিম। পরীক্ষায় তাহার কি বুঝিলে?

মেঘাবতী। এতক্ষণে বুঝিলাম, আপনি আমারই হইবেন।

করিম। করিম আজ হইতে তোমার দাসানুদাস হইল।

মেঘাবতী। দেখুন খাঁসাহেব, আমার পা হাত বড় কাঁপ্‌ছে।

করিম। কেন?

মেঘাবতী। আপনার সেই সকল সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর আকার প্রকার মনে হয়েছে।

করিম। তাহারা আমার বেতন ভোগী, আজ হইতে তোমারও দাস হইল, তোমারও আজ্ঞাধীন হইল।

মেঘাবতী। তাহারা কোথায়?

করিম। দ্বারদেশে তোমার এবং আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মেঘাবতী। ভাল করিতেছ, কি জানি, যদি আমার পূর্ব্ব-স্বামী এখন আসিয়া পড়ে, তাহারা থাকিলে তবু হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিবে না—তখন সতর্কও হইতে পারিব। খাঁ সাহেব! যদি আমার স্বামী আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বড় লজ্জায় পড়িব।

করিম। এখানে তোমার স্বামী কিরূপে আসিবে?—আসিলে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তখনই দূরীভূত হইবে।

মেঘাবতী। আসিতে ত পারিবেই না, কিন্তু যদির কথা বলিতেছি। ধরুন আপনার যেন ওখানে কেহই নাই—আমার স্বামী আসিবে, বাড়ী ঢুকিলে, তখন কি করিব? সেই কথাটা শুধাইতেছি।

করিম। করিম খাঁর হৃদয় মাঝে লুকাইবে।

মেঘাবতী একটু কৃত্রিম মধুর হাসি হাসিয়া খাঁসাহেবের মনটুকু টুক্ করিয়া কাড়িয়া লইল, পুনশ্চ বলিল, "খাঁ সাহেব, এ হাসির কথা নয়;—বলুন কোথায় লুকাইব, আমার বড় ভয় হইতেছে।"

করিম। এখনও কি তুমি তোমার স্বামীকে ভয় কর?

মেঘাবতী। না না, তেমন ভয় করিব কেন,—যখন আপনি রহিয়াছেন, তখন সে আসিয়া আমার কি করিবে? তবে, চিরদিন তাহার অন্ন খাইয়াছি, সেবা করিয়াছি, হঠাৎ চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করিতে যেন একটু বাধ বাধ ঠেকে, তাই বলিতেছি। বুঝিয়াছেন?

করিম। তোমায় এই পর্য্যঙ্কের নীচে রাখিব।

মেঘাবতী। ও হরি! তবেই তোমার সহিত আমার প্রণয় করা হইবে—সেকি খুঁজিয়া দেখিবে না?

করিম। তবে কোথায় লুকাইবে?

মেঘাবতী। আমি তোমার পোষাক পরিব।

করিম। ঠিক! যা বলিয়াছ ঠিক,—কিন্তু আমি?

মেঘাবতী। তুমি আমার চাকর সাজিবে কি বল।

করিম। ঠিক, বহুৎ আচ্ছা বেশ বুদ্ধিমতী বেশ কথা।

মেঘাবতী। আচ্ছা, তোমার ও পোষাক পরিলে আমাকে ত চিনিতে পারিবে না কি বল।

করিম। বোধ হয় পারিবে না।

মেঘাবতী। বোধ হয় পারিবে। আপনার আদেশ পাইলে আপনার পোষাকটা আমি একবার পরিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতাম, দেখিতাম আপনি আমায় চিনিতে পারেন কি না।

করিম একেবারে গলিয়া গিয়াছে, হাতে আসমান পাইয়াছে, সাহ্লাদে কহিল, "প্রিয়ে, দাসের পোষাক তুমি পরিবে, তাহাতে

আমার অনুমতির অপেক্ষা কি?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিজের গা হইতে পোষাক খুলিয়া দিল।

মেঘাবতী তাহা তৎক্ষণাৎ পরিধান করিল। করিম বলিল, চমৎকার শোভা হইয়াছে।" পোষাক ঝক্ মারিয়াছে। বলিহারি!

মেঘাবতী পদচারণ করিতে লাগিল, আর এক একবার করিমের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ শর ক্ষেপণ করিতে লাগিল! যে তীক্ষ্ণ শরে শ্রীরামচন্দ্র অবলীলাক্রমে সপ্ততাল বিধিয়াছিলেন, যে তীক্ষ্ণ শরে পার্থ দ্রোণ গুরুকে অনায়াসে নিপতিত করিয়াছিলেন, সে শর অপেক্ষাও এ শর তীক্ষ্ণ, সে শর দৃশ্যমান—এ শর অদৃশ্যভাবে ছুটিতেছে, অদৃশ্যভাবে হৃদয়ে ফুটিতেছে। ভোগবতী মেঘাবতী অভিপ্রায় বুঝিয়া অগ্রেই সরিয়াছে। মেঘাবতী পদচারণ করিতে করিতে একবার বাহিরে গেল, আবার ভিতরে আসিল, আবার গেল আবার আসিল, তিন চারিবার এইরূপ করিতে করিতে ঝনাৎ করিয়া দরজা দিয়া চাবী লাগাইল। দ্রুতবেগে বাটীর বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণকে বলিল, "জেনানা পলাইয়াছে ধর, ধর—শীঘ্র ধর। সৈন্যগণ সকলে একবাক্যে, "কোন পথে পলাইল, কোন পথে পলাইল," বলিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল! মেঘাবতী তাহাদিগকে পশ্চিমদিগের পথ দেখাইয়া বলিল, "এই পথে গিয়াছে। পূর্ব্বদিনের মত ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নির্ব্বিবাদে সম্মুখ দিয়া পলাইল, কেহই তাহা দেখিতে পাইলে না। একটা সামান্য রমণী এতগুলা লোকের চক্ষে ধূলা দিল। ছি ছি ছি, কি লজ্জার কথা! সৈন্যগণ আর কাল বিলম্ব না করিয়া বায়ুবেগে পশ্চিমাভিমুখে অশ্ব ছুটাইল।

সকলে চলিয়া গেলে মেঘাবতী দেখিল করিমখাঁর অশ্ব তথায় সজ্জিত রহিয়াছে। হঠাৎ একটী বুদ্ধি যোগাইল। ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিব বলিয়া তাহাতে উঠিতে যাইবে, পূর্ব্বকৌশলে ভোগবতীও সেখানে উপস্থিত হইল, সে এতক্ষণ কোথায় লুকাইয়াছিল। সে বালিকা, তাহার বিচরণে কেহ তত বাধা প্রদান করে নাই। ভোগবতীকে লইয়া মেঘাবতী করিমখাঁর অশ্বে আরোহণ করিয়া সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিল। অশ্ব প্রাণপণে পূর্ব্বদিকে ছুটিল।

নবাবহাটে আসিয়া রাত্রি প্রভাত হইল—অশ্বটি দম ফাটিয়া মরিয়া গেল, তাহারাও তখন ক্লান্ত হইয়াছে। কিয়ৎকাল এক-স্থানে বসিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। একঘণ্টা পরে বর্দ্ধমানে পঁহুছিল। মুসলমানের পোষাক নবাব-হাটে ছাড়িয়া উভয়ে হিন্দুস্থানী রমণীর ন্যায় পোষাক পরিয়াছে। বর্দ্ধমানে আসিয়া মেঘাবতী বলিল, ভোগবতী! আমরা এতদিন পুণ্যময় গঙ্গাতীরে বাস করিয়া এখন কোথায় বঙ্গদেশে মরিতে আসিলাম, এখানে থাকা হইবে না, যে দেশে গঙ্গা আছে সেই দেশে যাইব।

ভোগবতী। সে কোন দেশ?

মেঘাবতী। কেন কালনা। স্থান [illegible]

ভোগবতী। দিদি তবে সেইখানে [illegible]

দিবাবসান সময়ে মেঘাবতী এবং ভোগবতী বর্দ্ধমান পরি-ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্ব মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। শক্তি-গড় পার হইয়াই একটা প্রকাণ্ড মাঠ ও তথায় নিবিড় বন দেখিতে পাইল, পার্শ্বে মহা শ্মশান—শ্মশানের উপর দিয়া পথিকগণের রাস্তা। শ্মশানের উপর আসিয়া ভোগবতী হঠাৎ

বলিয়া উঠিল, "দিদি! আমাকে কিসে কামড়াইল। মেঘাবতী ভীত হইয়া "কি কামড়াইল দেখি" বলিয়া হাত দিয়া দেখিল কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভোগবতী "দিদি বড় জ্বালা করিতেছে, আমার হাত পা অবশ হইতেছে, হয় ত আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সর্পে দংশন করিয়াছে ভাবিয়া মেঘাবতী আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া পায়ের দুই তিন স্থান দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিল, কিন্তু ভোগবতী আর অধিকদূর চলিয়া যাইতে পারিল না। সেই মহা শ্মশানের উপরেই ঢলিয়া পড়িল। মেঘাবতী ভোগবতীকে কোলে করিয়া "ভোগবতী ভোগবতী বলিয়া চারি পাঁচবার ডাকিল, কোন সাড়া শব্দ পাইল না। তখন "কি হ'লোগো"! উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দনে শ্মশানভূমি একটি বার যেন কাঁপিয়া উঠিল।

মেঘাবতীর চীৎকার শব্দে চারিদিকেপ্রতিধ্বনিত হইল। কোথা হইতে পাঁচ সাতজন লোক বাহির হইয়া জিজ্ঞাসিল; "কে কাঁদ গো!" তাহারা মেঘাবতীর নিকট আসিয়া, দাঁড়াইল।

মেঘাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিল। তাহাদিগের মনে দয়া হইল বলিল, "মা আর মড়া কোলে করিয়া কাঁদিয়া কি করিবেন—কাঁদিলে কি বাঁচিবে। দিবস হইলেও না হয় চিকিৎসা চলিত এ রাত্রিতে কি ওঝা মিলিবে। আর মিলিলেও এখন বাঁচাইতে পারিবে না, সে সময় চলিয়া গিয়াছে। উহাকে পরিত্যাগ করুন ও আর বাঁচিবে না। আমরা বেশ জানিতেছি।

মেঘাবতী ভোগবতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাহাদের মুখে যখন শুনিল, সে মরিয়া গিয়াছে তখন অনেক কাঁদিল,

অনেক হা হুতাশ করিল, তাহারা প্রবোধ দিয়া বলিল, "মা উহার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে, আবার আপনিও কি এই শ্মশানে মারা পড়িবেন, এ স্থান ভাল নহে।"

রজনী বুঝিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ হইতে প্রিয়ভগ্নীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিল।

প্রিয় পাঠক! তাহারা ডাকাত। পূর্ব্বে যে জঙ্গলের কথা শুনিয়াছেন, ইহারা সেই জঙ্গলেই বাস করে। যখন মেঘাবতীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহারা কোথায় ডাকাতি করিয়া ফিরিয়াছে। মেঘাবতী যে উপায়ে আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে ও দস্যুগণ তাহা শুনিয়া চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইল, রজনীকে বলিল, "মা, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আপনাকে সামান্য রমণী বলিয়া বিবেচনা হয় না। আপনি মহা সতী; সেই সতীত্ব বলেই দুষ্ট যবনের হস্তে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন। ঈশ্বর নিরবচ্ছিন্ন সতীর গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরাও সেই সতীপদে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করি।

আর একজন বলিল, কি করিব—বেটা যদি আমাদের দেশের হইত, তাহা হইলে তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতাম, মাথাটা কাটিয়া আনিয়া আপনার পা'র তলে ফেলিয়া দিতাম।

মেঘাবতী। তার লোকজন অনেক আছে।

দস্যু। হউক না কেন মা—সতীর কোপে পড়িয়া সে দুষ্ট কদিন বাঁচিবে। রাবণেরও অনেক লোক ছিল—অনেক সম্পত্তি ছিল—কিছুই রহিল না—সে-ও ত সেই মহা সতীর অভিশাপে। এখন যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তবে আমরা আপনাকে স্থান দান করিতে পারি। আর যদি কোনও লোকালয়ে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারেন তবে বলুন, কোথায় আপনাকে রাখিয়া আসিব।

মেঘাবতী। তোমরা কি লোকালয়ে বাস কর না?

দস্যু। না মা।

মেঘাবতী। তবে তোমরা কে?

দস্যু। আমরা যে হই পরে আপনি পরিচয় পাইবেন, তবে এইমাত্র বলিতেছি, আমাদের নিকট আপনার কোনও বিপদ আশঙ্কা নাই।

দস্যুদিগের বাক্যে মেঘাবতীর ভয় দূর হইল, বলিল "আমি তোমাদিগেরই আশ্রয় থাকিব।" তাহারা মেঘাবতীকে লইয়া জঙ্গলে আসিল। তথায় বহুকালের একটী পুরাতন ইমারত ছিল, তাহারই কয়েকটী কক্ষ তাহার বাসস্থানের জন্য নিরূপিত হইল। দস্যুগণ তথায় স্বইচ্ছায় কেহ যাইতে পারিত না। মেঘাবতীর কোনও আবশ্যক হইলে একটী বাঁশী বাজাইত, বাঁশীর শব্দ পাইবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া আজ্ঞামত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিত। তাহারা মেঘাবতীকে রজনী নামে অভিহিত করিয়াছিল।

পাঠক মহাশয়! রজনী সেই বিশ্বম্ভর সিংহের জ্যেষ্ঠকন্যা মেঘাবতী। আর যিনি আমাদিগের এই উপন্যাসের প্রধান নায়িকা, সেই শ্মশান-বাসিনী ইহার কনিষ্ঠা—ভোগবতী। তাহাকে মৃতজ্ঞানে মেঘাবতী শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, সেই রাত্রিতেই সুরেন্দ্র সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাকে লইয়া যায়।

রজনী ক্ষত্রিয় কন্যা—ক্ষত্রিয় তেজে তেজস্বিনী। তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসা পাবক শিখার ন্যায় নিয়ত ধূ ধূ জ্বলিতেছে। করিমর্খাঁর পাশব অত্যাচার অবিশ্রান্ত জাগিতেছে। সে তাহার পিতৃহন্তা—সে তাহার অমূল্য সতীত্ব হরণেচ্ছুক। তাহার হনন

ইচ্ছায় দস্যুদিগকে নানারূপ উপদেশ—বিবিধ কৌশলে উৎসহিত করিল, তাহারা বীরমদে মাতিয়া উঠিল। মুক্তকণ্ঠে গাইতে লাগিল,—

মাতহ সকলে, সাজহ সবলে
বৈরিদলে দল বীরগণ।
সতীর জীবন সতীত্ব রতন,
রাখিবারে কর প্রাণপণ।
মরিবার তরে ধ'রেছ জীবন,
মরণের ভয় তবে কি কারণ,
যদি মর বলি
কেহ দেয় গালি,
শুনিতে পার না সে কখন।
কাল কি হইবে ভাবিয়ে না দেখি,
ক্ষণিক সুখেতে হ'য়ে আছ সুখী,
পর উপকার,
জীবনের সার,
তাহে নাহি কভু যায় মন।
চক্ষু মুদি দেখ কি আছে সংসারে,
স্থাপিত সংসার ঘোর অন্ধকারে,
আজি দেখ যাহা,
কালি নাহি তাহা,
আছে মাত্র ভবে এক জন।

রজনী বলিল "দুরাচার যবন বোধ হয় এদেশেও আসিবে সে দুরাশা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমরা নিয়ত সাবধানে অবস্থান করিও কি রজনী কি দিবসে যখনই

এই জঙ্গল মধ্যে কোনও অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিবে, তখনি সঙ্কেত শব্দ করিবে, সঙ্কেতমাত্র আমি আপন আত্মরক্ষার উপায় করিব। সময়ে সময়ে অর্থের বিশেষ আবশ্যক হইবে, তাহা তোমরা ডাকাতি করিয়া সংগ্রহ করিও। কিন্তু সকল বাটীতে নয়। যাঁহাদের সদ্ব্যয় আছে, যাঁহাদের বাটীতে প্রত্যহ শত সহস্র দিন দরিদ্র অন্ন পাইতেছে, যাঁহাদের যত্নে দরিদ্র শিশুগণ বিদ্যালাভ করিতেছে,—ব্যাধিপীড়িত অনাথ-গণ সতত চিকিৎসিত হইতেছে, তাঁহাদের ধনে তোমাদের কোন অধিকার নাই—সেদিকে কদাচ দৃক্‌পাত করিও না। যাহারা অর্থ পিশাচ, যাহাদের অর্থে জগতের কোন উপকার নাই জানিবে, তাহারা তোমাদের নিমিত্তই সেই ধন সঞ্চয় করিতেছে, স্বচ্ছন্দে তাহাদের অর্থ গ্রহণ করিবে, তাহাতে কোন পাপ অর্শিবে না। দস্যুগণ রজনীর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিল। সেই হইতেই রজনী দস্যুদলে মিলিত হইয়া ঐ জঙ্গল মধ্যে বাস করিতেছে। মেঘাবতীর পলায়নের কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই করিম খাঁর জ্ঞান চৈতন্য হইল, সে বুঝিল যুবতী বড় চাতুরী করিয়া পলাইয়াছে। বাহিরে আসিবে—দেখিল দ্বার বন্ধ। উচ্চৈঃস্বরে গণিমিঞাকে ডাক দিল, গণিমিঞা দ্রুতপদে আসিয়া দেখিল দ্বারে চাবী। বলিল কি খাঁ সাহেব! দ্বারে চাবি কেন? খাঁসাহেব এখন লজ্জিত। মেঘ ডাকিল, মেঘে বিজলী হাসিল, পথিক নিজ গন্তব্য পথ দেখিল, আবার বিপন্ন হইল—যে আঁধার সেই আঁধার। বলিল "পলাইয়াছে! এখন চাবী ভাঙ্গিয়া আমায় বাহির কর, হাঁপাইয়া মরিলাম।" গণিমিঞা করিমকে চাবি ভাঙ্গিয়া বাহির করিল। কি পরিতাপ! কি মনস্তাপ!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রিয়া বিনা শূন্যময় এ ভব সংসার,
জীবনে মরণ তার গৃহ শূন্য যার!

সৎসঙ্গ লাভ।

মেঘাবতী নবাবগঞ্জ হইতে বাঙ্গালায় আসিলে তাহার স্বামী ভুপাল সিংহ শুনিল তাহার ধর্ম্মপত্নীকে দুর্ব্বৃত্ত করিম খাঁ বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে বিবাহ করিবে, এতদিন করিত, মেঘাবতী এখনও সম্মত হয় নাই। করিম খাঁ এখনও তাহাকে একমাস সময় দিয়াছেন, এই এক মাসের মধ্যে মেঘাবতী তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিবে। বহু মুখে কথার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, ভুপাল সিংহ মেঘাবতী সম্বন্ধে যাহা শুনিল, তাহা কতদূর সত্য পাঠক মহাশয় তাহা বেশ বুঝিতেই পারিয়াছেন।

ভুপাল সিংহের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল—জ্বলিয়া উঠিল সত্য কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। করিম খাঁ ধনবান, দেশের এক প্রকার মাথা—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেরই তিনি নেতা। ইচ্ছা করিলে তিনি স্বেচ্ছায় জাতি কুল, মান মর্য্যাদা রক্ষা বা নষ্ট করিতে পারেন। শত শত মোসাহেববৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্রে মৌমাছির ন্যায় সতত ঘুরিতেছে। পণ্ডিত মহোদয়গণ তাহার আণ্ডা যরা প্রাণঠাণ্ডা করা হইয়াছেন। পাঠক মহাশয়! বোধ হয় আণ্ডা

ধরার অর্থ বুঝিয়া থাকিবেন—না বুঝিয়া থাকেন, একবার দুই একটা গ্রাম্য পাঠশালা ঘুরিয়া আসিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। পাঠশালে এরূপ আণ্ডাধরা ছাত্রও গণ্ডা গণ্ডা পাওয়া যায়। গুরু মহাশয় পড়াইতেছেন "আটচল্লিশ কড়ায় সাড়েসতের গণ্ডা" যাহারা আণ্ডা ধরা ছাত্র, তাহারা প্রথম কথাটা না বলিয়া শেষের "ণ্ডা" কথাটা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিয়া উঠিতেছে "আ—ণ্ডা।" তাঁহারাও সেইরূপ আণ্ডাধরা। করিম খাঁ বলিল "হিন্দু ধর্ম্মটায় অনেক হিন্দুর বড় একটা শ্রদ্ধা হয় না" পণ্ডিত মহাশয়গণ সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করিলেন "আজ্ঞে জে ধর্ম্মটা ভারি—গোলমেলে, শ্রদ্ধা হবে কেন। আর হিন্দুর শাস্ত্রটা ত মিথ্যায় পরিপূর্ণ। কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা এ সব কিছুই নয় "এক আল্লা নাস্তি দ্বিতীয়ং" ধরন লাফ দিয়া গাছে উঠিতে পারিলে, তলায় ঘুরিবার আবশ্যক কি?

করিম। আচ্ছা হিন্দু রমণী বহু বিবাহ করে না কেন—তাহাতে দোষ কি?

পণ্ডিত। কিছুই না—বরং না করাটাই দোষ। যখন স্ত্রী পুরুষ পরস্পর উভয়কেই আজীবন—স্থায়ী সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, তখন রমণীর পুরুষ এবং পুরুষের রমণী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করাই সর্ব্বোতোভাবে উচিত। সংসারটি অমূল্য রত্নের খনি। খনি হইতে একবারে নির্ব্বাচন করিয়া উত্তোলন করা অতি অসম্ভব। আঁজলায় যত ধরিতে পারে তুলিয়া ফেলিলাম, তাহার মধ্যে দুখান চকমকির পাথর উঠিল। পরীক্ষায় যেটা দেখিলাম পাথর, সেটা ফেলিয়া দিলাম—যেটা আসল রত্ন, সেটাকে গ্রহণ করিলাম। বিবাহটাও তো সেরূপ রত্ন সঞ্চয়।

করিম। রমণীকে স্বাধীনতা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত। আজ্ঞে তাবলে—খুবই কর্ত্তব্য। একথা আমি একগলা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে—(জিব কাটিয়া) আহাহা—তোবা! তোবা! আপনাদের কোরাণ হাতে ক'রে বলতে পারি। স্বাধীনতা না দেওয়াতে হিন্দু রমণীগুলি চালাক চতুর হইতে পারিল না—স্বামীর সহিত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দুটো কথা কহিতে পারিল না; এই সমস্ত অসামাজিক ব্যাপার দেখে আমি গৃহিণীকে সংশোধনের জন্য একদিন ব'লেছিলাম, "ওগো, দিন রাত কেন অন্দরের ভিতর প'চে মর, এক আধবার ঐ মাঠটায় গিয়ে একটু আধটু হাওয়া টাওয়া খেয়ো।" সে কথায় গৃহিণী একবারে মারমুখী—বল্লে "আমাকে তুমি এমন কথা বল, পরপুরুষকে আমি মুখ দেখাতে যাব।" আমি দেখলাম ও বাবা এ বড় বেগতিক একেবারে ব'য়ে গেছে, এ দোষ ম'লে যাবার নয়—চেপে গেলাম। কি করি বলুন, প্রিয়ার বশবর্ত্তী জগৎ।

করিম। স্ত্রীই পুরুষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, কেমন।

পণ্ডিত। আজ্ঞে সে কথাই বাহুল্য। স্ত্রী, পুরুষের যেটা শ্রেষ্ঠ জীবন সেইটে পিঞ্জর—রমণী তাতে পোষা সুখদায়িনী শুক পাখি। পুরুষ মৌচাক—রমণী তাতে অমৃতময় মধু। পুরুষ সাপের চক্র—রমণী তাতে তীব্র হলাহল। পুরুষ ঔষধ—রমণী তাতে অনুপান। পুরুষ নৌকা—রমণী তাতে দিক ফিরাবার হাল। মোসাহের মহাশয়গণ এইরূপে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। ইহার উপর করিম খাঁ বিষম জালিয়াৎ। দিল্লীর বাদসা তাহার জাল জুয়াচুরি ধরিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার অনেক সৈন্যকেও অর্থে বশীভূত করিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে তাহারা গোপনে করিম খাঁর সহায়তা করিত।

ভূপালসিংহ হীনবল ক্ষত্রিয়—কি করিবে! সে পতঙ্গ—করিম প্রজ্জ্বলিত বহ্নি! তাহার সহিত দ্বন্দ্ব সম্ভবে না। সে সকল বিষয় আলোচনা করিয়া অগত্যা ক্রোধানল হৃদয়ের মধ্যে গোপন করিল, কিন্তু নিভিল না। ধিকি ধিকি জ্বলিতেই থাকিল। ক্রমে ক্রমে কঠোর উদ্যম—দৃঢ় অধ্যবসায় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। মেঘাবতীর অকৃত্রিম প্রণয়—নিঃস্বার্থ ভালবাসা একবার ভাবিবার অবকাশ নাই, চিন্তা কি—দুষ্টের দমন—দুষ্ট করিম খাঁর নিপাত,—বিশ্বাসঘাতক গণিমিঞার স্বহস্তে শিরচ্ছেদ।

ভূপালসিংহ শীঘ্র নবাবগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিল, কেন আসিল তাহা সেই বলিতে পারে। সহসা এক সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিলেন। বহুদিন তাঁহার সেবা করিয়া একদিন উপদেশ পাইল,—

"ভকতি সে রাম মিলে হে,
শুদ্ধ চিত্ত সে ভজে।
ধীর চিত সে যুক্ত করে,
মুষা পাকড়ে গজে।"

সন্ন্যাসীর কথায় ভূপালের হৃদয় বড়ই উৎসাহিত হইল। আর তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া তদীয় শুশ্রূষায় সতত রত হইল, বুঝিল সন্ন্যাসী উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে সফল কাম হইতে পারিব। ইনি সেই পূর্ব্ব কথিত সন্ন্যাসী এবং ভূপালসিংহ তাঁহার শিষ্য বিপ্রদাস। সন্ন্যাসী ভূপালকে বিপ্রদাস বলিয়া ডাকিতেন, সেই জন্য আমরাও এপর্য্যন্ত তাহাকে বিপ্রদাস বলিয়া আসিতেছি।

আজ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে পীড়িত হইয়া দুইটী মুসলমান যুবক একটা ঝোপের ভিতর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে

ছিল। বিপ্রদাস দূর হইতেই তাহাদিগকে দেখিয়া সুস্পষ্ট যবন বলিয়া চিনিতে পারিল। মনোমধ্যে ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া দ্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল,—এবার বিপ্রদাসের ভীষণ যোদ্ধৃবেশ। বর্ম্ম চর্ম্ম তরবার উষ্ণীষ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অতি ধীর মৃদু গমনে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, একজন গণিমিঞা অন্য ব্যক্তি তাহার অপরিচিত। তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! কিন্তু এত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত যে বিপ্রদাসের শুষ্ক পত্র পুঞ্জের উপর পদ ক্ষেপের শব্দেও তাহাদের চৈতন্য হইল না। গণিমিঞার স্কন্ধদেশে অসির অগ্রভাগ স্পর্শ করাইয়া বলিল "রে যবন! শীঘ্র গাত্রোত্থান কর!" ত্রাস্তে যুবকদ্বয় জাগিয়া উঠিল এবং বিপ্রদাসকে স্পষ্ট চিনিতে পারিল। তাহারা তখন নিরস্ত্র, বিপ্রদাসকে সশস্ত্র দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল, বিপ্রদাস বলিল, মূঢ় যবন! ভয় নাই; নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; ইচ্ছামত সজ্জিত হ। তাহারা তাড়াতাড়ি অস্ত্র উঠাইয়া লইয়া বিপ্রদাসকে বেগে আক্রমণ করিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গণিমিঞা, সমভি-ব্যাহারী যুবক ধরাশায়ী হইল। গণিমিঞা পলাইয়া শ্মশান-বাসিনীর শরণ লইল। শ্মশান-বাসিনী তাহাকে বিপ্রদাসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিল, তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণে সোহাগা কি শোভা বিলায়,
অপূর্ব্ব মিলন বিধি করিল দোঁহায়।

কালী তারা।

কৃপাময়ের কৃপায় আজ সুরেন্দ্রের বাটীতে মহা হুলুস্থূল। পাড়া প্রতিবেশীনীদের আজ বউ দেখার একটা ধুম পড়িয়াছে। এখন আর শ্মশান-বাসিনী নহে,—চাটুর্য্যেদের ছোটবউ। গত রাত্রিতে আসিয়া বিপ্রদাস যখন সুরেন্দ্রের মাতার নিকট শ্মশান-বাসিনীর পরিচয় দেয়, তখন নামটী তাঁহার বড় একটা পছন্দ হয় নাই। তিনি বলিলেন, "বউটি দেখতে শুনতে ভাল হ'য়েছে বটে, তবে ও নামটা রাখা ভাল হয় নাই। শ্মশান-মশান ওসব অমঙ্গুলে কুমঙ্গুলে নাম কেন গা। সকালে উঠে ডাকবো—ইহকাল পরকালের কাজ হবে, তেমন নাম না হ'লে কি নাম ? দেখ—আমি বউমাকে "আজ থেকে কালি তারা" ব'লে ডাকবো,—আহা নামটি মুখ ভরা প্রাণ ভরা।

পাঠক মহাশয়! সুরেন্দ্রের মাতা শ্মশান-বাসিনীকে কালি-তারা বলিয়া ডাকুন—আমরা কিন্তু শ্মশান-বাসিনী বলিব।

শ্মশান-বাসিনী নূতন আসিয়াছে—বনের স্বর্ণলতা এখন উদ্যানে রোপিত হইয়াছে—তাই আজ নম্রমুখী। সদ্য রোপিত লতিকা এইরূপই হইয়া থাকে—সে জন্যও বটে, আর বিপ্রদাস আসিতে আসিতে সংসারিক কর্ত্তব্য বিষয় অনেক শিখাইয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ীকে কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হয়, কিরূপে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, তাঁহাদের নিকট কিরূপ

নম্রভাবে থাকিতে হয়, প্রতিবেশীদের সহিত বা কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ইত্যাদি অনেক বিষয় শ্মশান-বাসিনী এক দিনে শিখিয়া লইয়াছে।

শশান-বাসিনী কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না, কোনও দিকে চাহিতেছে না, মাথায় এক হাত ঘোম্‌টা দিয়া ঘাড় নোওয়াইয়া রকে বসিয়া আছে। দুখানি পা, দুখানি হাত ব্যতীত আর কোনও অঙ্গটি দেখিবার যো নাই। সুরেন্দ্রের মাতা সমাগত প্রতিবেশীদের জনে জনে সম্ভাষণ করিতেছেন ও নব-বধুর মুখ দেখাইতেছেন। বউ কি করে জনে জনে ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতেছে। বধুর সুশীলতায়—নম্রতায় সকলেই এককালে মুগ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ রূপ দেখিয়া সকলেই উৎফুল্ল মুখে কত প্রকার সুখ্যাতি করিতেছে। যাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না, পরের সুখে যাহাদের হৃদয় পুড়িয়া যায়, পরের কোন ছিদ্রান্বেষণ যাহাদের জীবনের ব্রত, পরের কুৎসা করা যাহাদের চিরকাল স্বভাব, পূরিষ প্রপূরিত কুণ্ডের ন্যায় যাহাদের হৃদয়, কেবল তাহাদের মুখ মলিন হইল, হৃদয়ে করাঘাত করিতে লাগিল, চক্ষু যেন পুড়িয়া গেল। এক জন অপর জনের কাণে কাণে বলিল, "এতই কি ছাই সুন্দরী—সুন্দরী বলি সেই ও পাড়ার ঘটকদের সেই বেঁটে বউকে। ছুঁড়ী যদি আর দু আঙ্গুল মাথায় উঁচু হ'তো, আর কপালটা যদি একসুতো নীচু হ'তো, তা হ'লে এ তার কাছে আদৌ দাঁড়াতে পারতোনা।" এইরূপ যাহার যা মনে আসিল সে তাহাই বলিল, ফলতঃ শ্মশান-বাসিনীর ন্যায় সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না।

বউ দেখিয়া সকলে আপনাপন গৃহে চলিয়া গেল। কেবল

তের চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা তিনটি যুবতী ব'য়ের কাছ ছাড়িল না। তাহারা ঝিউড়ী মেয়ে এতক্ষণ প্রাণ খুলিয়া ব'য়ের সহিত মোলায়েম গোছ আলাপ করিতে পায় নাই, এখন নির্জ্জন পাইয়া তাহারা আলাপ আরম্ভ করিল। একজন জিজ্ঞাসিল "তোমার নাম কি ভাই?" বউ একটু অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া উত্তর করিল, "আমার নাম ভাই কালী তারা।" সুরেন্দ্রের মাতা যা শিখাইয়াছেন তাই বলিল "কালী তারা।" প্রথমোক্ত যুবতীর কাণে নামটি যেন তত ভাল লাগিল না, একটু নাক মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "কালী তারা! তা বেশ নামটি, পাড়াগাঁয়ে ঐ নামই প্রশংসার।" শ্মশান-বাসিনী জিজ্ঞাসিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

যুবতী। আমার নাম ভাই শিব বিলাসিনা, এর নাম কালী ভামিনী, ওর নাম হরমোহিনী।

শ্মশান-বাসিনী। সহরের লোক বুঝি এই সকল নাম রাখে?

যুবতী। আগে রাখিত না, এখন রাখিতেছে। রামমণি, শ্যামমণি, কৃষ্ণমণি, গঙ্গা, যমুনা এ সব নাম এখন আর নাই। ও নাম শুনে কাণ প'চে গেছে—তাই এখন বড় বড় লোকে বিদেশ হ'তে এই সব নূতন নামের আমদানী ক'রেছে। দেখ দেখি ভাই—কেমন মিষ্টি নাম! কেবল নাম কেন বিদেশের সকল জিনিষই বড় ভাল। আমাদের সহর বাজারের বড় লোকেরা বিদেশের শালকাঁটা পেপে টবে করিয়া মনোহর প্রমোদ বন সাজায়। দেশের ফণিমনসার বাগানে বেড়া দিয়ে ছাগল গরু আটকায়, বিদেশের ফণিমনসা উঠানে পুতে তাতে দুসন্ধ্যা জল ঢালে। বিদেশের পেঁচাটা, আমাদের কোকিলটে। বিদেশের গাধার ডাক আমাদের ভাই যেন বীণা ঝঙ্কার মনে

হয়। থাক দিন কতক,—কত জানবে, কত দেখবে, কত শুনবে। কত বুঝবে।

দ্বিতীয় যুবতী জিজ্ঞাসিল, "বউ তুমি চিঠি পত্র লিখিতে জান?"

শ্মশান-বাসিনী। না ও সব জানিনা।

দ্বিতীয় যুবতী। তোমার মা বাপ পাঠশালে বুঝি প'ড়তে দেয় নাই? এমন মেয়েকে মূর্খ ক'রে রেখেছে! সোণার প্রতিমা রাংতায় সাজিয়েছে! আমাদের ভাই চালের টিকটিকীটি, বিছানার ছারপোকাটি অবধি সবাই চিঠি লিখিতে জানে।

শ্মশান-বাসিনী। কোথায় চিঠি লিখে?

দ্বি, যুবতী। বউ! তুই ভাই নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে। কাকে চিঠি লেখে তা জানিসনে! যাকে চোখের অন্তরে রাখতে প্রাণ কাঁদে, এক দণ্ড যাকে না দেখলে নিয়ত মন হু হু করে, যার কাছে প্রাণের কথা ব'লে মনে শান্তি পাওয়া যায়, সে যদি দূরদেশে থাকে, তাকেই চিঠি লিখিতে হয়।

শ্মশান-বাসিনী। কি ব'লে লিখিতে হয়?

দ্বি, যুবতী। তার আলাহিদা গত আছে। যেমন বেহালা শিখিতে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সাতটি স্বর সাধতে হয়, তেমনি প্রেম-পত্র লিখিতে হ'লে প্রথমে প্রাণেশ্বর, দ্বিতীয়ে প্রাণেশ, তৃতীয়ে প্রাণের প্রাণ, চতুর্থে প্রিয়, পঞ্চমে প্রাণাধিক, ষষ্ঠে প্রাণবল্লভ, সপ্তমে প্রিয়তম। এই কটার যেটা হোক্ লিখিতে হয়। তার পর মনের ভাব - তা পদ্যেই লেখ আর গদ্যেই লেখ।

শ্মশান-বাসিনী। সে ভাব কিরূপ বলনা ভাই?

দ্বি, যুবতী। ভালবাসার জিনিষ খানিক ক্ষণ না দেখতে পেলে সে ভাব আপনি উদয় হয়। যে দিকে চাওয়া যায় সেই

দিকেই দারুণ বিরহের চিত্র দেখা যায়। দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে একমনে ব'স্‌লেই হ'লো। এই জ্যৈষ্ঠমাস গ্রীষ্মের দিন, ছাদের উপরে একখানি বেশ শীতল পাটী বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবচি, মাথার উপরে চাঁদখানা ধীরি ধীরি চ'লে বেড়াচ্চে, কখন বা মেঘে ঢাকা প'ড়ে জগত আঁধার কচ্চে, অমনি কবিতা মনে হ'লো—

সুনীল গগণে বিমল শশী,
চকোরিণী মন মোহিত যায়।
আঁধারি জগতে কেন রে বিধি
মেঘের মাঝারে লুকালি তায়।

মেঘে ক'রেছে বিদ্যুৎ হান্‌চে চাতকিনী ফটিক জল—ফটিক জল রবে চীৎকার ক'রছে, কখন বা মেঘের ডাক শুনে চম্‌কে চম্‌কে উঠেছে, একটা কবিতা মনে হ'লো—

মেঘের উদয়ে বিজলি খেলে,
চমকী চমকী চাতকী চায়,
আনন্দ-সাগর ভাসায়ে-তরী
দুঃখের ভাবনা কেনরে হায়।

এ সকল কথা শ্মশান-বাসিনী পাঁচটা বুঝিল, পাঁচটা নাও বুঝিল। বলিল, "যাহাকে ভালবাসিব তাহার সংবাদ লইব, তাহাকে সংবাদ দিব, অত আড়ম্বর করিয়া লিখিব কেন! তাহাতে কি সে সুখী বেশী হইবে? সে আমাকে ভালবাসে আমার দুঃখে কাতর হয়, তবে তার সম্মুখে কাঁদিয়া তাহাকে বৃথা কাঁদাইব কেন? যাহাকে ভালবাসিব তাহার জন্ত গোপনে কাঁদিব, তাহাকে কখনও জানিতে দিব না। আমি তোমাকে ভালবাসি তোমার জন্ত অধীর হইয়াছি, এ কথায় তাহার

হৃদয়ে আঘাত লাগিবে—আমার গোপন প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইবে!” শ্মশান-বাসিনী তাহাদের মত আলাপ করিতে শিখে নাই, প্রণয় কেমন তাহাও শিখে নাই, ভালবাসা কিরূপ তাহাও শিখে নাই—শিখিয়াছিল কেবল মনে মনে কাঁদিতে। কাল বিপ্রদাস সুরেন্দ্রকে যখন আশ্রম হইতে যাইতে বলে, তখন শ্মশান-বাসিনীর চোকে জল পড়িয়াছিল। আবার যখন শুনিল তাহাকেও সুরেন্দ্রের সহিত যাইতে হইবে, তখন মুখ-খানি প্রফুল্ল হইয়াছিল। আজ আবার যখন তাহাকে সুরে-ন্দ্রের বাটীতে রাখিয়া ভোরে বিপ্রদাস চলিয়া যায়, তখন এক বার বিপ্রদাসের জন্য ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল। বিপ্রদাস অশ্রু-মোচন করিয়া বলিল, “শ্মশান-বাসিনী!” কাঁদিও না—আবার আসিব। তাই সে তাহার নিকট হইতে যাইতে পারিয়াছিল।

নানাবিধ আলাপে অনেক বেলা হইল; প্রতিবেশিনী যুবতী-ত্রয় চলিয়া গেল। শ্মশান-বাসিনী সুরেন্দ্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

“নচ অন্য ধনং বিনা ধান্য ধনং”

সুরেন্দ্র সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে বাটী আসিয়া প্রায় ছয় বৎসর নিরাপদে কাটাইল। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তাহার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন।

যখন শতদল আসিয়াছিল তখন সুরেন্দ্রের পুত্রটি এক বৎসরের, মাতাও জীবিতা ছিলেন। এখন সংসারে কেবল সুরেন্দ্র, শ্মশান-বাসিনী এবং শরত। শরতের বয়স এখন পাঁচ বৎসর। সুরেন্দ্র শ্মশান-বাসিনীকে লইয়া যখন বাটিতে আইসে তখন বিপ্রদাস তাহাকে কয়েকখানি বহুমূল্যের হীরকাভরণ ও কিছু স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিল। সুরেন্দ্র সেই সমস্ত অর্থের কিয়দংশে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছে।

ইহ জগতে চিরদিন কাহারও সমভাবে অতিবাহিত হয় না। দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ, জগতে ইহা জীবমাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। সুরেন্দ্র সুখী হইয়াও আবার এক নূতন বিপদে পড়িল।

নয় শত বত্রিশ সালের আশ্বিনমাসে দুর্ভিক্ষ লক্ষণ প্রকাশ পাইল। গত দুই বৎসর সুচারুরূপ ফসল জন্মে নাই। নয় শত ত্রিশ সালে অতিরিক্ত বর্ষায় সমস্ত হাজিয়া যায়, একত্রিশ সালে পঙ্গপাল নামক এক জাতীয় পতঙ্গে সমস্ত নষ্ট করে। পূর্ব্বে এ দেশের শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইত না, এই জন্ত প্রচুর পরিমাণে ধান চাল দেশেই মজুত থাকিত। দুই এক বৎসর ফসল না হইলেও হঠাৎ অন্নকষ্ট হইত না।

যে দুই বৎসর ফসল হয় নাই, সে দুই বৎসর দেশের মজুত ধান্যেই লোকের সংসার চলিয়াছিল, যদিও অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল, লোকের তত কষ্ট বোধ হয় নাই। বত্রিশ সালে হাহাকার রব উঠিল। শ্রাবণ মাস কাটিয়া গেল, চাষিকে মাঠের ধারে যাইতে হইত না। আকাশে বৃষ্টি নাই আজি হইল না কালি হইবে এইরূপ আশার আশ্বাসে থাকিয়া চাষজীবিগণ

চৈত্রমাস হইতে শ্রাবণ মাস কাটিয়া গেল, ফলে বৃষ্টি হইল না। দেবতা যেন চারিদিকে খরতর কাষ্ঠের আগুণ জ্বলিয়া দিল। কোন কোন চতুর কৃষক সেচনাদির দ্বারায় অগ্রে যাহা আবাদ সারিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রতিকুলতায় শেষে রক্ষা করিতে পারিল না। সকলেই মহা বিপদ গণিল। যাহারা নাতোয়ান চাষী তাহাদিগের ঘরে কান্না উঠিল। কর্ত্তা গৃহিণীর হাতের রূপার পৈছে বাঁধা দিয়া রাজা মহাজনের খাজনা দিয়া আসিয়াছিল, তাহার উদ্ধার আর হইল না—জমীদারেও নিরূপিত খাজনা পাইল না। কর্ত্তাকে বাহিরে জমিদারের খাজানার তাগাদা, ঘরে গৃহিণীর গহনার তাগাদা সহিয়া জীবন্মৃত ভাবে দিন কাটাইতে হইল। যাহারা নাতোয়ান, যাহাদের বাড়ীতে দুই চারিটা গোলা বাঁধা আছে, তাহাদের মাহেন্দ্রযোগ হইল। গৃহিণী গহনাব একটা লম্বা চৌড়া ফর্দ্দ পাড়িল। এবার খাঁটিরূপার বাঁকমল আর বাউটী দিতে হইবে। সেক্‌রা মুখপোড়ারা সেবারের মলে পদার্থ রাখে নাই—সব খেয়েছে। কর্ত্তার এখন উভয় সঙ্কট, গৃহিণীর মন রাখে কি দেনার দায়ে বিক্রিত সাবেক ঘরের নিষ্কর জমাটী খরিদ করেন। বলিল হাবি! সব পাবি—ঈশ্বরকে ধেয়া, এখন মদ্‌গম্ সাহেবকে সিন্নি মান—যেন ধানের বাজারটা একটু গরম হয়, টাকায় যেন এক এক কাঠা ক'রে চাল হয়, তা হলে কাহন পিছু যোল কুড়ী টাকা হয়। গৃহিণী পীরের সিন্নী মানিল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। চাউলের দর টাকায় এক কাঠা হইল।

সুরেন্দ্র বলিল "শ্মশান-বাসিনী! যেরূপ দুর্ব্বৎসর পড়িল, সকলকে এবার অনাহারে মরিতে হইবে।"

শ্মশান। টাকা গুলো পুতিয়া রাখ না কেন?

সুরেন্দ্র। এ দুর্ভিক্ষে আর টাকায় কি হইবে? শ্মশান এখন টাকায় এক কাঠা চাউল কিনিতে পাইতেছি, দুদিন পরে কি আর তাও পাওয়া যাইবে। সকলেই ধান চাল বিক্রয় একবারে বন্ধ করিয়াছে, পয়সা দিয়াও একসের চাল মিলবে না। তোমার আমার ভাগ্যে যাহা হয় হবে, শরতকে কেমন করিয়া বাঁচাইব আমি তাই ভাবিতেছি।

শ্মশান। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, ভাবিয়া কি করিবে। আমাদের অপেক্ষাও অনেক কাঙ্গাল গরিব আছে, যদি তাহারা মরে তাহা হইলে আমরাও মরিব। ভগবান কি কাঙ্গালের মুখ চাহিবে না। শরৎকে না হয় বিপ্রদাদার কাছে পাঠাইয়া দিব।

শরৎ। না আমি সেখানে যাইব না।

শ্মশান। এখানে কি খাইয়া বাঁচিবে? দেশে যে আকাল হইয়াছে—ভাত কোথায় পাইবে বাবা?

শরৎ। ভাত না হয় মুড়ী খাইয়া থাকিব, আমি মুড়ী খাইতে খুব ভাল বাসি।

সুরেন্দ্র শ্মশান-বাসিনীকে একটা শাবল আনিতে বলিল। শ্মশান-বাসিনী দ্রুতপদে গিয়া শাবল আনিয়া দিলে সুরেন্দ্র অলঙ্কার এবং নগদ টাকাকড়ি যাহা ছিল, সমস্তই গৃহের এক কোণে পুতিয়া ফেলিল।

ক্রমে কার্ত্তিক মাস পড়িল, দুর্ভিক্ষ অতীব ভীষণ আকার ধারণ করিল। জলাশয়ে বিন্দুমাত্র জল নাই, মাঠে একগাছি তৃণ নাই। জলাভাবে তৃণাভাবে গরু বাছুর অকালে মরিতে সুরু হইল। চোর দস্যুতে দিবসে আসিয়া লোকের গোলা ভাঙ্গিয়া ধান চাল লুটিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। টাকা কড়ি গহনা

পত্র কেহই স্পর্শ করে না। টাকা দিয়া আর চাল পাওয়া যায় না। চারিদিকে কেবল ত্রাহি রব উঠিল। ভিক্ষুকের ভিক্ষা করা বন্ধ হইল, রাজ মজুরের মজুরি বন্ধ হইল, চারিদিকে কেবল হা হা শব্দ। নানাবিধ অখাদ্য বৃক্ষের পাতা খাইয়া কতলোক ক্ষিপ্ত হইল—কতলোক পীড়াবশতঃ মরিয়া গেল। দস্যু হস্ত হইতে যাহারা কিছু কিছু ধান চাল রক্ষা করিয়াছিল তাহাদেরও আর খাইবার যো নাই। আহার করিতে বসিলে কোথা হইতে কে ছুটিয়া আসিয়া কোল হইতে অন্নপাত্র কাড়িয়া লইয়া যায়,—কাড়িয়া লইলে ছোট ছোট কাঙ্গাল শিশুগণ কাঁদ কাঁদ মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়া "মা এক মুঠা ভাত দাও, আমরা তিন দিন কেবল গাছের কাঁচা পাতা খাইয়া আছি" এই বলিয়া কাকুতি মিনতি করে চোকের জল ফেলিতে থাকে। সকলের দেহ অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, মস্তকের কেশরাশি তৈলহীন, গায়ে তৈলাভাবে খড়ি উড়িতেছে। সেই সকল ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্যমান শিশুদিগকে সম্মুখে রাখিয়া কোন পাষণ্ডব্যক্তি আহার করিতে পারে। কাজেই মুখের গ্রাস ছাড়িয়া দিতে হয়। দুইপ্রহরের সময় শত শত কাঙ্গালী ভাতের মাড় লইবার জন্য দ্বারদেশে আসিয়া হুড়া হুড়ি করে। পাঁচ হইতে আট দশ বৎসর বয়স্ক শিশু,—যাহারা অন্নাভাবে কঙ্কাল-বিশিষ্ট হইয়াছে, যাহাদের হুড়াহুড়ি করিয়া লইবার আদৌ শক্তি নাই, তাহারা অন্তরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কেবল চাহিয়া থাকে, কেহ দয়া করিয়া যদি এক মুষ্টি দিল, তবেই খাইতে পাইল। না দিল, অনলসম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া গেল। কোথায় মাতা, কোথায় পিতা, আর কোথায় বা পুত্র,—কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ রহিল না। একমুঠা

অন্নের জন্ত পিতা পুত্রকে বিক্রয় করে, মাতা ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মুখ হইতে আপন উদর পূরিতির তরে আহার কাড়িয়া খায়। কেহবা এত কষ্ট চক্ষে দেখিতে না পারিয়া সন্তানদিগকে নষ্ট করিয়া শেষে আপনারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে সুরেন্দ্র এবং শ্মশান-বাসিনী কোনও দিন এক সন্ধ্যা আহার, কোনও দিন বা উপবাস করিয়া কাটাইতেছিল, দুই দিন আর আদৌ হাঁড়ি চড়ে নাই। দুই দিন নিরাহার।

কৃষ্ণানন্দ ঘোষ এদেশের মধ্যে একজন খ্যাতনামা চাষী, সুরেন্দ্রের বড় অনুগত লোক। সে সময়ে সময়ে সুরেন্দ্রের নিকট হইতে বিনা সুদে টাকা কড়ি ধার পাইত, তজ্জন্ত তাহার উপকার মনে রাখিয়াছিল। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে সুরেন্দ্র এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্রের এ পর্য্যন্ত আহার যোগাইয়া আসিতেছিল,—আর পারিল না। চোরে তাহার গোলা ভাঙ্গিয়া সমস্ত ধান চাল লইয়া গিয়াছে।

আজ প্রহর অতীত হইল, কিছু খাবার যোগাড় হয় নাই। শ্মশান-বাসিনী গালে হাত দিয়া একমনে ভাবিতেছে, শরৎ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া "মুড়ী দাওনা, ভাত দাওনা" বলিয়া মার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কখনও বা পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি চাপড় মারিতেছে। সুরেন্দ্র এ মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিতে পারিল না। ঘর হইতে নামিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার পরম সুহৃৎ কৃষ্ণানন্দ ঘোষ সেইদিকে আসিতেছে। তাহার হাতে একটী বৃহৎ ঝুড়ি। নিকটবর্ত্তি হইলে জিজ্ঞাসিল, "ঝুড়ি কি হইবে কৃষ্ণানন্দ?"

কৃষ্ণানন্দ। আর—দাদাঠাকুর! যাচ্চি খাবার যোগাড়ে,

"যখন যেমন, তখন তেমন" এক সময়ে যার ঘরে মিঠাই মণ্ডা ছড়াছড়ি হ'তো, ভাত মুড়ির কত স্বচ্ছল ছিল, আজ আবার তার ঘরে শাক সিদ্ধ পড়্‌তে পায় না। কি করি—যাচ্চি পদ্ম-ফুলের ডাঁটা কাট্‌তে। উপস্থিত তাই সিদ্ধ ক'রে এখন তো ছেলে কটাকে খাওয়ান যাক, পরে আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে এখন। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ত তাদের উপসী রাখতে পারবো না। যাবে ত চল—পদ্মের ডাঁটা মন্দ জিনিস নয়, সিদ্ধ ক'রে দিলে শরৎ এখন বেশ খেতে পারবে।

সুরেন্দ্রকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ আবার বলিল, "দাদাঠাকুর! এখন ও সব মানের কান্নায় কেঁদো না। এ বাজারে ধনী, মানী, অমানী—সব এখন এক দর। পয়সা দিয়ে চাল মিলে না কি কর্‌বে বল! সুরেন্দ্র যাইতে স্বীকার করিল। একজন কবি বলিয়াছেন; "স্বর্ণ ধনং নচ অন্য ধনং।" অপর সুবিজ্ঞ কবি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, "ধান্য ধনং নচ অন্য ধনং।" আজ শেষোক্ত সেই কবির বাক্যই মূল্যবান বলিয়া প্রমাণিত হইল। পথে এক তোড়া মোহর ফেলিয়া রাখিলে কেহ সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিবে না, এক-ঠা চাউল দেখিলে তাহার উপর হাজার লোক পড়িবে। সুরেন্দ্র কৃষ্ণানন্দের সহিত চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রতিহিংসা হৃদিমাঝে হু হু রবে জ্বলে,
নাহি নিভে সেই বহ্নি জলে কি অনলে!

অভাবনীয় বিপদ।

প্রিয় পাঠক! এক্ষণে আবার সেই জঙ্গলে আসিয়াছি, যেস্থানে দস্যুদুহিতা রজনী এবং শতদলকে একদিন ক্ষণমাত্র দেখিয়াছিলেন। যে স্থানে শত শত ভীম পরাক্রম দুর্দ্দমনীয় দস্যুগণ রজনীর আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থান করিতেছে, যে স্থানে অনায়াসে লুণ্ঠিত ভূরি ভূরি ধন রত্ন সকল ভাণ্ডারে রক্ষিত হই-তেছে, যে স্থান ভয়াবহ বলিয়া অহর্নিশি জনশূন্য—আবার সেই জঙ্গলে আসিয়াছে। আজ আর জঙ্গল জনশূন্য নহে—শত শত অস্ত্রধারী মুসলমান সৈন্য কর্তৃক বনভূমি পরিবেষ্টিত। ভিতরে একটি ঝোপের অন্তরালে সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দ দণ্ডায়মান।

সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দ এখানে কেন আসিল তাহা বলি-তেছি। আজ তাহারা একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পদ্মের মৃণাল তুলিতে যাইতেছিল। কৃষ্ণানন্দ পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্ত নিবিড় ধূম পটলে আচ্ছাদিত হইয়াছে। চমকিয়া বলিল "দাদাঠাকুর! বুঝি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" সুরেন্দ্র "কি হইয়াছে" বলিয়া চারি-দিকে চাহিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। কৃষ্ণানন্দ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "দেখিতেছ না, ঐ দিকটায় খুব আগুন লাগিয়াছে—আর কিছুই রক্ষা হইল না। এবার সুরেন্দ্রও

দেখিতে পাইল, বলিল, "তাইত কৃষ্ণানন্দ! ও যে ভয়ানক অগ্নি-কাণ্ড—কোথায় বল দেখি!"

কৃষ্ণানন্দ। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, চল ফিরিয়া যাই। আমার উঠানে একগাদা বিচালি আছে। সেগুলা সামালি।

সুরেন্দ্র। তা থাক—আগুণ অনেক দূরে, এদিকে আসবে না। কৃষ্ণানন্দ হতভম্ব হইয়া দেখিতেছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর! অত ঘোড়া কেন বল দেখি—সিপাহি নয় ত?" দেখ দেখ।

সুরেন্দ্র বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "সিপাহিই বটে, বোধ হয় বাদ্‌সা অথবা কোনও রাজার সৈন্য এদিকে আসিতেছে। যাহা ধূম বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহা ধূম নহে—ধূলা।

কৃষ্ণানন্দ। উহারা আসিতেছে—না যাইতেছে?

সুরেন্দ্র। আসতেছে। দেখিতেছ না, ক্রমে ক্রমে আমাদের কত নিকটবর্ত্তী হইল!—উহারা এই পথেই আসিবে।

কৃষ্ণানন্দ। তবে এখনও দাঁড়াইয়া আছ?

সুরেন্দ্র। কি করিব?

কৃষ্ণানন্দ। যদি আমাদের কাটিয়া ফেলে!

সুরেন্দ্র। এখনও কি প্রাণের আশা কর কৃষ্ণানন্দ।

কৃষ্ণানন্দ শিহরিয়া উঠিল। ব্যাকুল স্বরে বলিল, কেন দাদাঠাকুর—এমন কথা বলিতেছ যে! তবে কি আমরা উহাদের হাতে রক্ষা পাইব না?"

সুরেন্দ্র। তা নয়, আজ মরিলে সিপাহির হাতে মরিব, আজ না মরিলে কাল না খাইয়া মরিব, তবে আর ভয় কি! মরণের হাতত্তো এড়াইতে পারিব না।

কৃষ্ণানন্দের দুটি চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, বলিল, "তাত ঠিক দাদাঠাকুর—তবে কিনা, বাড়ীতে মরিলে সকলকে দেখিয়া মরিতাম, এ আর মরণকালে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।" সিপাহিগণ নক্ষত্রবেগে আসিতেছে, তাহারা দেখিতে দেখিতে প্রান্তর পার হইয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল, কেহ তাহাদিগকে চাহিয়াও দেখিল না। কৃষ্ণানন্দ আবার বলিল, "দাদাঠাকুর!" সুরেন্দ্র অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিল, "কেন?"

কৃষ্ণানন্দ। ওরাত কই আমাদের কিছুই বলিল না?

এ কথার আর উত্তর পাইল না। আবার "দাদাঠাকুর! তুমি কি ভাবিতেছ?" বলিয়া সজোরে পৃষ্ঠে ধাক্কা মারিল। সুরেন্দ্রের চৈতন্য হইল, বলিল "কৃষ্ণানন্দ! আবার একটা নূতন অচিন্তনীয় বিপদ উপস্থিত, তাই ভাবিতেছি। আমাকে শীঘ্র যাইতে হইল।"

কৃষ্ণানন্দ। কোথায় দাদাঠাকুর?

সুরেন্দ্র। সেই জঙ্গলে।

সেই সকল সৈন্যদিগের মধ্যে সুরেন্দ্র এক ব্যক্তিকে চিনিয়াছে, সে সেই গণিমিঞা। গণিমিঞা পাঠকের পরিচিত। সে শ্মশান-বাসিনীর অনুগ্রহে বিপ্রদাসের হস্তে রক্ষা পাইয়া যে দিন পলাইয়া যায়, সেদিন একবার সুরেন্দ্রের সম্মুখে পড়িয়াছিল।

গণিমিঞা বিপ্রদাসের বিপক্ষ, সে তার অনিষ্ট সাধনের জন্য বহুদিন হইতে বহু প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে, এ কথা সুরেন্দ্র বিপ্রদাসের মুখে একদিন শুনিয়াছিল। কিরূপ অনিষ্ট এ কথা সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসাও করে নাই—বিপ্রদাস বলে নাই, আজ সে সৈন্য লইয়া সেইদিকে চলিয়াছে। বিপ্রদাস যদি

এ বৃত্তান্ত না জানিয়া অসাবধানে অবস্থান করে তাহা হইলে সমূহ বিপদ ঘটিবে—কি প্রাণ যাইবে এ কথা কৃষ্ণানন্দকে বুঝাইয়া দিয়া বলিল, "আমি বিপ্রদাসকে সতর্ক করিতে চলিলাম, তুমি বাড়ী ফিরিয়া চলিয়া যাও। বাড়ীতে বলিও, কাল ফিরিব।"

কৃষ্ণানন্দ। তাহারা দুই দিন অনাহারে আছে, আজ আবার তুমিও চলিলে, এমন করিয়া তাহারা কদিন বাঁচিবে?

সুরেন্দ্র। আমি থাকিয়া কি উপায় করিতে পারিব? যা হউক, আর তাহাদের কথা মনে করিব না।

কৃষ্ণানন্দ বুঝিয়া বলিল, "ঠিক কথা দাদাঠাকুর আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করিতে পারিব না। দুই দিন কত চেষ্টা করিলাম কাহারও আহার যোগাইতে পারিলাম না। তবে মিছা মিছি, তাহাদের জন্য আর কাঁদি কেন? তাহারা মরিলে—আমরা রাখিতে পারিব না তবে কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব? যদি দেহের মাংস কাটিয়া দিয়াও তাহাদিকে বাঁচাইতে পারিতাম তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহা করিতাম। যখন কোনই উপায় হইল না, তখন এ সব আর চক্ষে দেখিয়া কাজ নাই, চল আমিও তোমার সহিত যাইব।"

কৃষ্ণানন্দ এবং সুরেন্দ্র সেই জঙ্গলের উদ্দেশে চলিল। শক্তি গড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সৈন্যশ্রেণী সেই স্থানের একটী প্রান্তরে আড্ডা করিয়াছে। সুরেন্দ্রের কিছু ভরসা হইল, বলিল "কৃষ্ণানন্দ! ভাবিতেছিলাম উহারা তথায় পঁহুছিবার অগ্রে বিপ্রদাসকে কেমন করিয়া সংবাদ দিব। উহারা যখন এখানে আড্ডা করিয়াছে তখন আজ বোধ হয় যাইবে না, আমরা সন্ধ্যার সময় পঁহুছিতে পারিলেও তাঁহাকে সতর্ক করিতে পারিব, চল একটু দ্রুত যাই।"

উভয়ে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম না করিয়া অবিরাম গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রবেশ করিল, তথায় বিপ্রদাসের সাক্ষাৎ পাইল না।

অন্য একটা জঙ্গল আছে, বিপ্রদাস সেখানেও কখন কখন যাইত। সেখানে যাইয়াও সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া বলিল "কৃষ্ণানন্দ! চল আর এক জঙ্গলে যাই।" কৃষ্ণানন্দের আর কোনও আপত্তি নাই, অমনি চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যাও হইল, তাহারাও জঙ্গলে পঁহুছিল। উভয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে, এদিকে অশ্বারোহী সৈন্যদলও উপস্থিত হইল। পাছে সৈন্যগণ তাহাদিগকে দেখিতে পায় সেই জন্য একটী ঝোপের অন্তরালে দুইজনে লুকাইল। সৈন্যগণ জঙ্গল ঘিরিয়া ফেলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সতী সেই পতিপদে বাঁধা যার মন,
কে পারে করিতে তার সতীত্ব হরণ।

যেসা কি তেসা।

দুরন্ত যবন সৈন্য দলে দলে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, হঠাৎ সেই সময় রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত একটি মধুর সঙ্গীত শ্রুতি গোচর হইল, সে সঙ্গীত কে গাহিল?

বীরত্বে স্ববলে, সাজিয়ে সদলে,
শত্রু দলে দল বীরগণ।

সতীর জীবন, অমূল্য রতন,
সতীত্ব রাখিতে কর পণ॥

সুধা সম সঙ্গীতলহরী সুমধুর সন্ধ্যা-সমীরণে খেলিতে খেলিতে সুদূর অম্বরে গিয়া ধ্বনিত হইল। আবার তান উঠিল,—

বীরত্বে স্ববলে, প্রস্তুত সকলে,
করে ধরি মহা প্রহরণ।
ধরণী রুধিরে, ভাসিবে সত্বরে,
মন কষ্ট হবে নিবারণ॥

বন পক্ষীকুল দিগ্‌দিগন্তর হইতে স্ব স্ব নীড়ে আসিয়া নীরবে সেই গান শুনিতে লাগিল,—

বীরত্বে স্ববলে, সাগ্রহ সদলে,
শত্রু দলে দল বীরগণ।
সতীর জীবন, অমূল্য রতন,
সতীত্ব রাখিতে কর পণ॥

যবন সৈন্যগণ স্থির কর্ণে বনের দিকে চাহিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিল;—

বীরত্বে স্ববলে, প্রস্তুত সকলে,
করে ধরি মহা প্রহরণ।
ধরণী রুধিরে, ভাসিবে সত্বরে,
মন কষ্ট হবে নিবারণ॥

সঙ্গীত শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইল। এবার করিম খাঁ স্বয়ং আসিয়াছে। সে বলিল, "শুন গণিমিঞা, এমন মনমুগ্ধকর সুললিত সঙ্গীত কোথায় হইতেছে। যদিও সঙ্গীতের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতেছিনা, তত্রাচ হৃদয় বড় আকৃষ্ট হইতেছে।"

গণিমিঞা স্থির কর্ণে অনেকক্ষণ শুনিয়া বলিল "বোধ হয় এ রুস্তুমের সেই জেনানার।"

করিম খাঁ এককালে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিল "তব্ জল্‌দি পাকড়ো জেনানাকো!"

অমনি সৈন্যদলে বহু মুখে শব্দ হইল "জল্‌দি পাক্‌ড়ো জেনানাকো।"

জঙ্গল মধ্যে রজনীর কর্ণগোচর হইল "জল্‌দি পাক্‌ড়ো জেনানাকো।"

গণিমিঞা সৈন্যগণের প্রতি আদেশ করিল "পাকড়ো জেনানাকো।"

আজ্ঞামাত্র সৈন্যগণ সদর্পে মহাবেগে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। কেবল করিম খাঁ ও কয়েকজন পারিষদ বাহিরে রহিল মাত্র। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। জঙ্গলে কোথায় কি আছে কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, তাহাতে সৈন্যদিগের বিচরণের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল দেখিয়া গণিমিঞা এক প্রকার আলোক জ্বালিল। তাহা বিদ্যুতের ন্যায় তেজপূর্ণ আভাময়—বহু স্থান ব্যাপক। বিদ্যুতালোকে চক্ষু ঝাঁধিয়া যায়—ইহা শীতলকৌমুদীর ন্যায় অতি নয়ন স্নিগ্ধকর। সেই আলোক কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে এরূপ কৌশলে স্থাপিত করিল যে তদ্বারা অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দিবসের ন্যায় দৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈন্যগণ দস্যুদিগের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল, কিন্তু জন প্রাণীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না।

সকলে বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, এবং সকলেই যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইল।

আবার সেই তীব্র শব্দ—আবার সেই ঝিঁ ঝি পোকার ঝিল্লির ন্যায় অবিরাম ঝিঁ ঝিঁ শব্দে বন আকুল হইল—কর্ণ [illegible] প্রায় করিল—সৈন্যদিগের তথায় অবস্থান দুষ্কর হইয়া উঠিল। পক্ষীগণ নীড় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—পশুগণ গহ্বরাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল। কোথায় এরূপ শব্দ হইতেছে কেহই তাহার নির্ণয় করিতে পারিল না। বৃক্ষের উপর হইতেছে ভাবিয়া কেহ তাহাতে আরোহণ করিল, দেখিল সে বৃক্ষে নহে—অন্য বৃক্ষে। আবার সে বৃক্ষে আরোহণ করিল, মনে করিল ঝোপের মধ্যে, ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুঝিল যেন ভূগর্ভে। ডাকাত ধরিবে কি—তাহারাই প্রথমে বিষম শব্দ বিভ্রাটের প্রথমকাণ্ডে পড়িল। এখানে নয়—ওখানে এইরূপ করিয়া সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে হঠাৎ একজন কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপরে কি হলো" বলিয়া ধরাশায়ী হইল। মুহূর্ত্ত মাত্র সকলের সেইদিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল একটী তীর তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আবার তথায় দুইজন পড়িল। ক্রমে চারিদিক হইতে শন্ শন্ শব্দ করিয়া তীর আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে অনেক মুসলমান হত হইল। কেহ বা ভগ্নোদ্যম হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাহস পাইয়া চারিদিক হইতে শত শত দস্যু বাহির হইতে লাগিল। তাহাদের বেশ ভূষা অবিকল যবন সৈনিকের ন্যায়। হস্তে তীর ধনু। দেহ বীরত্ব ব্যঞ্জক।

উভয় দলে ভয়ঙ্কর ভাবে যুদ্ধ বাধিল। কে স্বপক্ষ কে বিপক্ষ তাহার কিছুই অনুভব হইল না, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না, কেবল চট্ চট্ শব্দে বনভূমি পরিপূর্ণ হইল।

যবন সেনা বিপক্ষ ভ্রমে ভীম বিক্রমে স্বপক্ষীয় অনেক সৈন্যকে নিপাতিত করিল। দস্যুদিগের কিছুই অপচয় করিতে পারিল না। তাহারা কেহ বৃক্ষের উপর, কেহ ঝোপের মধ্যে, কেহ বা গহ্বরে থাকিয়া ঘন ঘন তীর চালাইতেছে। তাহাদিগের অব্যর্থ সন্ধানে যবন সৈন্য ক্রমাগত হত হইতে লাগিল। যবনদিগের অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে শুদ্ধ তলওয়ার ও বল্লম। জঙ্গলের ভিতর ঘন সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলীতে আচ্ছন্ন। তীর ব্যতীত সেখানে আর কোন অস্ত্রই চালাইবার উপায় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া যখম হইতে হইল। তাহারা অস্ত্র থাকিতে যেন নিরস্ত্র—বল থাকিতে যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। দস্যুগণ অনায়াসে তাহাদিগকে বিজিত করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল। যে সকল যবন সৈন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে গণিমিঞা ব্যতীত এক প্রাণীও জীবিত রহিল না।

গণিমিঞা যখন দেখিল ডাকাতেরা তীর চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই ভগ্নোৎসাহ হইয়া একটা ঝোপের ভিতর গিয়া লুকাইয়াছে। সেই স্থানে সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দও ছিল—ভীষণ হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাহারা তথায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিয়াছে। যুদ্ধাবসানে দস্যুগণ চারিদিক অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিল। এদিকে বাহিরে করিম খাঁও বন্দী হইয়াছে। ভয়ার্ত্ত বলিয়া তাহাদিগকে কেহ প্রাণে মারিল না।

রজনীর আদেশে করিম খাঁ এবং গণিমিঞার দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া এক কারাগারে রাখিয়া দিল। অপর কারাগারে সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হায় বিধি এ কেমন বিচার তোমার,
শুভ কার্য্যে এসে দেখি বিপদ পাথার।

দুর্য্যোগে সুযোগ।

প্রায় আজ দশ দিন গত হইল, জঙ্গলে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে—আর কোনরূপ উপদ্রব নাই। বন্দী চতুষ্টয় জীবনে হতাশ হইয়া কারাগারে অবস্থান করিতেছে।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর—গভীর অন্ধকার,—জগৎ নিস্তব্ধ—সকলে নিদ্রিত। রজনী জাগিয়া আছে—কি ভাবিতেছে। অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া বসিল, অসি লইল, ধীরে ধীরে কপাটটি খুলিয়া বাহিরে আসিল। চারিদিক বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল, দেখিল রজনী বক্ষঃস্থিত বৃক্ষাদি প্রকৃতি-পুঞ্জে তিমির রাশির ঘোর সমাবেশ। আকাশে তারকাবলী মিটি মিটি জ্বলিতেছে। এক এক পা করিয়া কারাগারের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। কপাটে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, নিদ্রিত গণিমিএগ এবং করিম খাঁর ঘর্ঘর নাসিকা-ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইল না। যে কক্ষে সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দ অবস্থান করিতেছিল, সেই কক্ষের নিকটে আসিয়া শুনিল, তাহারা উভয়ে কথা কহিতেছে।

কৃষ্ণানন্দ বলিল "দাদাঠাকুর! একালে আর কাহারও ভাল করিতে নাই। আমরা এই দুর্ভিক্ষের দিন স্ত্রীপুত্রের মায়া কাটাইয়া বিপ্রদাসকে বিপদের সংবাদ দিতে আসিলাম, দেখ ভগবান

আমাদিগকেই আনিয়া বিপদে ফেলিলেন। আর কখন কাহারও ভাল করিতে যাইব না।"

সুরেন্দ্র বলিল, "এখন ত পরিত্রাণ পাও।"

কৃষ্ণানন্দ। ইহারা কি আমাদিগকে আর ছাড়িয়া দিবে না?

সুরেন্দ্র। যদি ছাড়িয়াই দিবে, তবে বন্দী করিল কেন? ইহারা ডাকাত। পাছে আমরা ইহাদিগকে ধরাইয়া দিই, সেই ভয়ে আমাদিগকে বন্দী করিয়াছে। এখন মৃত্যু ভিন্ন ইহাদের হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই।

কৃষ্ণানন্দ। আমাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে?

সুরেন্দ্র। যেরূপেই হউক—মারিয়া ফেলিবে। তাহার আর সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণানন্দ। যদি মারিয়াই ফেলিবে, তবে প্রত্যহ খাইতে দেয় কেন?

সুরেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "খাইতে দেয় মোটা হইবার জন্য, একটু মোটা হইলেই দিব্বি হাতের সুখে কাটিয়া ফেলিবে।"

কৃষ্ণানন্দ বলিল "তাই বুঝি তুমি কিছু খাইতে দিলে খাও না বটে—দাদাঠাকুর! এটা কি তোমার উচিত? তোমার পরামর্শ শুনিয়াই আমার এ দশা। তুমি না খাইলে রোগা হইবে, তোমাকে কাটিবে না, আর আমি খাইয়া মোটা হইব আমাকে কাটিবে—তুমি তাহা চক্ষে দেখিবে? এক যাত্রার পৃথক ফল দাদাঠাকুর! তোমার সঙ্গে আসিয়া আমি ঝকমারি করিয়াছি।" কৃষ্ণানন্দের চক্ষে জল আসিল। কণ্ঠস্বর ভার ভার হইল।

সুরেন্দ্র বলিল, "কাঁদিতেছ নাকি কৃষ্ণানন্দ?"

কৃষ্ণানন্দ বলিল, "এ যে কাঁদিবারই কথা! এই বিপদের সময় আমার সহিত প্রতারণা করা কি তোমার কাজটা ভাল

হইয়াছে। দুজনে সুখের দুঃখের কথা কহিতেছি। তুমি যে এ গরিবকে মারিয়া নিজে এমন বাঁচিবার ফিকিরে আছ, তা জানিতাম না—তাই ওরা কিছু দিলে নিজে না খাইয়া, "খাও কৃষ্ণানন্দ" বলিয়া আমাকে দিতে। মনে করিয়াছিলাম দাদাঠাকুর সঙ্গে আছে, আজ হউক কাল হউক, বা বহুদিন পরেই হউক, বাড়ী গিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিতে পাইব, তাহা আর হইল না।" এই কথা বলিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্র একটু সাহস দিয়া বলিল, "কৃষ্ণানন্দ! তুমি দেখছি বড় নির্ব্বোধ। আমি তোমাকে ওটা তামাসা করিয়া বলিলাম বুঝিতে পারিলে না। আমাকে কখন শূদ্রের জল খাইতে দেখিয়াছ কি?"

কৃষ্ণানন্দ বলিল "না।"

সুরেন্দ্র। তবে—এ হীনজাতি দস্যুদিগের জল কেমন করিয়া খাইব?

তখন কৃষ্ণানন্দের জ্ঞান হইল, সাহস পাইয়া বলিল, "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম যে দাদাঠাকুর ত আমাদের তেমন লোক নয়।"

সুরেন্দ্র বলিল, "আর ও সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর।"

কৃষ্ণানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার বলিল, "দেখ দাদাঠাকুর, আজ আমার ছোট ছেলেটীকে স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তাহাকে কোলে করিয়া মুখে খাবার তুলিয়া দিতেছি। আজও কি তাহারা না খাইয়া বাঁচিয়া আছে?" সব মরিয়া গিয়াছে।

সুরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না খাইয়া মানুষ কদিন বাঁচে—দু দিন খায় নাই দেখিয়া আসিয়াছ, আর এখানে

তিন দিন হইল। যা'ক, ও সকল আর ভাবিয়া কাজ নাই। মনে কর আমরাও যেন মরিয়া গিয়াছি।—আর এখানে বন্দী হইয়াছি ইহাও আমাদের পক্ষে এক প্রকার মঙ্গলের বিষয়, তাহাদের অনশন মৃত্যু চক্ষে দেখিতে হইল না।”

কৃষ্ণানন্দ বলিল, “দাদাঠাকুর! যদি একখান দা পাইতাম তাহা হইলে জানালার গরাদে কাটিয়া আমি পলাইতাম।”

সুরেন্দ্র। পলাইয়া এ রাত্রিতে কোথায় যাইতে বল?

কৃষ্ণানন্দ। কোনও ঝোপের ভিতর বসিয়া থাকিতাম কিম্বা তোমার শ্বশুর বাড়ী যাইতাম।

সুরেন্দ্র। কোথায়—অভয়নগর?

কৃষ্ণানন্দ। হাঁ।

সুরেন্দ্র। সে সম্বন্ধ এক প্রকার ঘুচিয়াছে।

সুরেন্দ্র শতদলকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে একথা আর অন্যে জানিত না, আজ কৃষ্ণানন্দের নিকট সকল কথাই ব্যক্ত করিল। বাহির হইতে রজনী তাহা শুনিয়া মনে মনে বড় আহ্লাদিত হইল, বুঝিতে পারিল এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন শতদলের স্বামী। ঈশ্বর এতদিনে বুঝি শতদলের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাহা না হইলে এ অসম্ভব ঘটনা ঘটিবে কেন? এখন ভরসা হইতেছে শতদলের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে মুক্ত হইতে পারিব। আগে রাত্রি ত প্রভাত হউক—বুঝিব তুমি কেমন পুরুষ! বড় শিকল কাটিয়া পলাইয়াছিলে,—যখন ফাঁদে পড়িয়াছ, তখন আবার শিকল পরাইব, দাঁড়ে বসাইব, ছোলা খাওয়াইব, বুলি ধরাইব, তুড়ি দিব, তবে ছাড়িব। এইরূপ নানাবিধ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার গিয়া শয়ন করিল কিন্তু আর নিদ্রা হইল না—এ পাশ ও পাশ করিয়াই রাত্রি প্রভাত করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আজি কি সুখের নিশি প্রভাত হইল,
মনে যারে চায় তারে আঁখি নিরখিল।

খতে সহি।

রাত্রি প্রভাত হইলে রজনী গাত্রত্থান করিল। প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপ্ত করিয়া আজ আর এক নূতন সাজে সজ্জিত হইল। পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়ের নিকট রজনী যে বেশে একবার উপস্থিত হইয়াছিল এখন আর সে বেশ নহে। প্রয়োজন হইলে কখন কখন সেরূপ বেশ করিতে হইত,—আজ স্বাভাবিক বেশ। একখানি বেগনি রঙ্গের চিক্কণ গরদের ঘাগরা পরা। রেশমী কাঁচলিতে বক্ষদেশ আঁটা। বাম নাসায় ক্ষুদ্র একটী পাথর সোন নাকছাবি। কাণে পিপুল পাতা—করে রত্ন চুড়—পদে এক প্রকার ঘুঙ্গুরগাঁথা ঝাপ। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিত সকল অঙ্গুলেই হীর-কাঙ্গুরী। আপাদ লম্বিত বেণী পৃষ্ঠদেশে ফণী আকারে ঝুলিতেছে। সীমন্তের সিন্দুর ললাটের কিয়দংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে। তখন স্ত্রীলোকেরা চুল উঠিয়া যাইবে বা কুদৃশ্য হইবে মনে করিয়া সিন্দুর ব্যবহার করিত না। তাঁহারা বুঝিত সিন্দুরই সতীর প্রধান ভূষণ।

রজনী এইরূপ বেশভূষা করিয়া শতদলকে জাগাইল—শত-

দল তখনও মনের সুখে ঘুমাইতেছিল। উঠিয়া চোক রগড়াইতে রগড়াইতে একবার রজনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মরি, আজ আবার কি সাজ।"

"এহিতর" বলিয়া রজনী ঈষৎ হাস্য করিল।

শতদল রজনীর মুখে কখন কখন দুই একটি হিন্দি কথা শুনিতে পাইত। সে তাহা ইচ্ছা করিয়া বলিত না, কেমন কথার সঙ্গে আপনি বাহির হইয়া পড়িত। আজ আবার "এহিতর" কথা শুনিয়া বলিল—

"প্রণাম গো বিবি সাহেব।"

রজনীও হাস্য করিয়া বলিল, "মর পোড়ারমুখী, প্রণাম না বন্দেগি।"

শতদল। ও কথা ভাই আমাদের মুখে আসে না—আজ এ বেশ কেন ভাই?

রজনী। কৈকো সাত মেই ভেট করেঙ্গি।

শতদল। রেখে দাও তোমার কেঁউ মেঁউ—আমরা ডাবাতে কথা বুঝিনা, ভাল করিয়া বলিবে ত বল।

রজনী। কোন লোকের সহিত দেখা করিব। তোমাকেও এইমত সাজিতে হইবে।

শতদল। কেন?

রজনী। সাজিতে নাই কি?—আর এলো চুলে খালি গায়ে কত কাল থাকিব?

শতদল। আর এক মাস।

রজনী। তার পর?

শতদল। তার পর নালিশ রুজু করিব।

রজনী। কোথায়?

শতদল। রজনীর দরবারে।

রজনী। কিসের নালিশ করিবে?

শতদল। বৃহৎ আশা ভঙ্গের।

রজনী। তোমায় আশা দিলেই বা কে—আর তাহা ভাঙ্গিলই বা কে?

শতদল। দিয়াছিল কমলা ঠাকুরাণী—ভাঙ্গিল এই দস্যুকন্যা।

রজনী। ভাঙ্গিয়া থাকে—আবার যোড়া দিয়া দিবে।

শতদল। ডাকাতদিগের কথায় বিশ্বাস নাই।

রজন। আর থেদে কাজ কি—ভাই, প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছি, সাজিবে এস এখন।

শতদল। এ আবার তোমার কোন দেশী প্রতিজ্ঞাপালন?

"ডাকাতের ঘরে এমনই বুঝি ব্যবস্থা। ভোজনের আগে পান, গানের আগে মান—আর বিয়ের আগে ফুলশয্যা" এই বলিয়া রজনী শতদলের ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া কেশ আচড়াইতে লাগিল।

শতদলের দেহের কিছুমাত্র যত্ন ছিল না। কেশ বাঁধিত না, গহনা পরিত না—তাহার সকল সাধই সুরেন্দ্রের সহিত গিয়াছিল। যে দিন কমলা ঠাকুরাণীর বাটীতে যায় সেই দিন গহনা পরিয়াছিল, সে কেবল—তাহার মাতার সাধ মিটাইতে। শতদল খালি গায়ে বেড়াইত তিনি তাহা দেখিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন "বাছা কত সাধ করিয়া অলঙ্কার গড়াইয়া দিলাম একটী বারও কি পরিবার সাধ হয় না?" সে দিন মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছিলেন "একবার গহনাগুলি পর, আমার সাধ মিটুক" সেই জন্যই পরিয়াছিল। রজনী আজ

সাজাইতে ছাড়িল না। সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম বিনাইয়া অপূর্ব্ব বেণী রচিল। মনের মত কবরী বাঁধিল, সোণার ফুল পরাইল, মুখখানি মুছাইল, সীমন্তের সিন্দুর আরও নব রঙ্গে রঞ্জিত করিল, বস্ত্র খুলিয়া ঘাগরা পরাইল—শতদল ঘাগরা পরিতে একান্ত নারাজ—নারাজ বলিয়া ছাড়ে কে, রজনীর ইচ্ছামত বেশ করিতে হইল। ডাকাতের ঘর—বসন ভূষণের অভাব নাই।

রজনী কেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া কহিল,—

"দিনমণি মেঘের কোলে
কমল কলি ফুটলো জলে"

শ্লোকটি বলিয়া একখানি দর্পণ আনিয়া শতদলের সম্মুখে ধরিল।

শতদল দর্পণখানি আস্তে ভূমিতে নামাইয়া রাখিল।

রজনী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিল "মর বামনি!" এত পরিশ্রম করিয়া সাজাইলাম দেখ একবার মুখখানি।—তা থাক এখন দেখিলে বড় সুখ হইবে না" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ একটী বাঁশী বাজাইল। সেটী পূর্ব্ব কথিত ডাকাতি সঙ্কেত। সঙ্কেতমাত্র একজন সশস্ত্র ডাকাত আসিয়া যুগ্ম করে বলিল, "কি করিব আদেশ করুন।"

রজনী বলিল, "সে দিন অপরিচিত যে দুই জন আসামী—যবনদিগের সহিত ধৃত হইয়া কারাগারে আছে, সত্বরে তাহাদিগকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস।"

"যে আজ্ঞা বলিয়া দস্যু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

"শতদল বিচার দেখিবে চল" বলিয়া রজনী তাহাকে অপর একটী কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষটী পরিপাটী রূপে সজ্জিত মেঝের উপর টানা বিছানা—প্রথমে মেঝে জোড়া একখানি মাদুর,

তার উপর তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট একখানি সতরঞ্চ সকলের উপর দীর্ঘ প্রস্থে চারি হস্ত পরিমিত মখমলে সোণালী কাজ করা একখানি জাজিম। জাজিমের উপর দুটী সাচ্চা কাজের সুন্দর তাকিয়ার। তাকিয়ার সামনে দুটী সুন্দর আতর দান, দুটী গোলাপপাশ, পানের ডিপে একটী। দিব্য বার্ণিস করা টেবিলের উপর কাচ পাত্রে দুটী গোলাপ ফুলের তোড়া, একটী সুন্দর দোয়াতে এক দোয়াত কালী, কলমদানীতে কলম, খানকতক সাদা কাগজ। তখন টেবিল সাজাইতে হইলে এইরূপই সাদাসিদে রকম সাজাইত। ইহাতে যদি পাঠক মহাশয়ের মনের মত না হইয়া থাকে তবে যিনি যেমন সাজাইতে জানেন তিনি সেই মত মনে কল্পনা করিয়া লইবেন। উপরে কারুকার্য্য নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ ঝলমল করিতেছে, তন্নিম্নে তড়িৎ বলে হু হু শব্দে টানা পাখা চলিতেছে। তখন দেশে তড়িৎ আবিস্কৃত হয় নাই বলিয়া যদি কেহ এ কথা বিশ্বাস না করেন, তবে বলা যাইতে পারে তড়িত না হইলেও পাখা এরূপ কৌশলে চালিত হইত যাহাতে এখনকার সুক্ষ্মদৃষ্টে তড়িত্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। দেওয়ালের চারিধারে নানাবিধ দেব দেবীর ছবিবিশিষ্ট আয়না—মাঝে মাঝে দেওয়াল গিরি বসান। গৃহটি অতি সুন্দর।

শতদল গৃহের সজ্জা দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিল "তুমি ভাই দস্যুকন্যা নও।"

রজনী বলিল, "কেমন করিয়া বুঝিলে?"

শতদল। ডাকাতেরা কি কখন এত সৌখিন? শুনিয়াছি তাহারা অতি অসভ্য জাতি, বনে বাস করে, এরূপ সৌখিন বন্দোবস্ত করিয়া কখনই গৃহ সাজাইতে পারিবে না—কেবল

ইহাই নহে, আরও অনেক বিষয় দেখিয়াছি, যাহাতে আমার তোমাকে কোনও রাজপুত্রী বলিয়া আমার মনে হয়।

রজনী হাসিয়া বলিল, "রাজপুত্রীর বড় সাধ কিনা তাই এই জঙ্গলে মরিতে আসিবে।"

শতদলও হাসতে হাসিতে বলিল, "পরিচয় না দাও এক-দিন না একদিন জানিতে পারিবই।"

রজনী শতদলের কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বিছানায় তাকিয়ার সম্মুখে বসাইল।

শতদল বসনাঞ্চলে অধর পল্লব ঢাকিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "আমার ভাই এখানে বসিতে কেমন লজ্জা করিতেছে।"

রজনী। ও হরি—তবেই হ'য়েছে। এইত বিয়ের সূচনা, এখনও সাত পাক বাকি, এরই মধ্যে এত লজ্জা! শেষে ধরা পড়িবি নাকি?"

শতদল। এখানে বসিয়া কি হইবে?

রজনী। সে দিন চোর ধরিয়াছি জান না! তাহাদের বিচার করিতে হইবে।

শতদল গালে হাত দিয়া একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল "ও মা! কেমন চোর তারা—ডাকতের ঘরেও চুরি, ধন্য সাহস। কি চুরি করিয়াছে?"

রজনী মৃদুস্বরে গাহিল,—

বাঁশরী বাজায়ে, অবলা মজায়ে,
পলায়েছে কালা নিঠুর হইয়ে।
সে কালার লাগি হয়ে সর্ব্বত্যাগী,
যথাতথা ফিরি যোগিনী সাজিয়ে

লইতে শিখেছ অবলার মন,
দিতে সে জানেনা কুটিল এমন,
তবু আঁখি তারে, চাহি দেখিবারে,
কি জ্বালা হইল পরের লাগিয়ে॥

শতদল গানের ভাব কিছুই বুঝিল না, বলিল "আহা কি মিষ্ট গানটি, আর একটি গাও।"

রজনীকে আর গাহিতে হইল না, অদূরে মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইয়া বলিল "গাহিব এখন, লোক আসিতেছে।"

লোক অসিতেছে শুনিয়া শতদল যেন কিছু সঙ্কুচিত হইল। মুখ নামাইয়া আড়চোকে পথের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রজনী তাহার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি সোজা করিয়া দিয়া বলিল "এমনি করিয়া থাক—লজ্জা করিলে চলিবে না।" তোমায় আর একটী কথা বলিয়া রাখি—বিচার কর্ত্তা আসামীর দোষ গুণের বিচার করিয়া দণ্ড দেন আবার পুরস্কৃতও করেন। তাহাতে মন বিচলিত হইলে বিচারকার্য্য চলে না। আজ তুমি আমি উভয়ে এই দরবারে বিচারকর্ত্রী। যতক্ষণ বিচারাসনে থাকিব ততক্ষণ উভয়কেই খুব কঠিন হৃদয় হইতে হইবে। এখনি দুইজন আসামীর বিচার হইবে। তাহাদের মধ্যে একজন যদি তোমার স্বামী হয়, আর যদি তার প্রতি কঠিন দণ্ডের আদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি যেন কাতর হইও না বা চোকে জল ফেলিও না। দেখ আইনের বাধ্য সকলেই, হইলই বা স্বামী?

"মর তুমি" বলিয়া শতদল রজনীর স্কন্ধদেশে একটী চপেটাঘাত করিল।

রজনী হাসিয়া বলিল "আমি মরিলে তোমার উদ্ধারের উপায় করিবে কে? এখন মন দিয়া শোন—বিচারের সময় আমি তোমাকে কোন এ বিষয়ের মধ্যস্থ মানিলে খুব চটপট করিয়া কথার জবাব দিবে। আর কথাগুলি একটু যেন অন্তঃস্বরে বলিও।

শতদল। তা হয়ত আমি পারিব না।

রজনী। পারিতেই হইবে, না পারিলে আদৌ চলিবে না।

তাহাদিগের এইমত কথোপকথন হইতেছে, দস্যু আসামীদ্বয়কে আনিয়া তথায় হাজির করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন সুরেন্দ্র, অপর কৃষ্ণানন্দ। সুরেন্দ্রকে দেখিয়াই শতদল চিনিতে পারিল। তাহাদিগের হস্ত পদ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিয়া শতদলের মুখখানি শুকাইয়া গেল, দুই চক্ষে জল আসিল। কিন্তু রজনীর উপদেশ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সারিয়া লইল। সুরেন্দ্র যুবতীদ্বয়ের অলোক সামান্য সৌন্দর্য্য এবং বেশভূষা দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইল। গৃহের সাজ সজ্জা দেখিবার ছলে চারি পাঁচবার শতদলের মুখের দিকে চাহিল। চারি পাঁচবার শতদল মুখ নামাইল।

কৃষ্ণানন্দ দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক হইয়াছে। হাঁ করিয়া রজনীর মুখের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতেছে। রজনী কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে কৃষ্ণানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "খবরদার বাঙ্গালী—আবি শির জুদা করেঙ্গি।"

কৃষ্ণানন্দ চমকিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ নামাইল; আর কোন দিকে চাহিতে পারে না। সুরেন্দ্র টলিল না।

রজনী জিজ্ঞাসিল "কে তুমি ?"

সুরেন্দ্র শুনিতে পাইল না, একমনে কি ভাবিতেছে—"রমণীদ্বয় কে ?" ইহাদিগের যেরূপ আকার প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, তাহাতে ইহাদিগকে স্বর্গের অপ্সরা ব্যতিত কখনও বনবাসিনী দস্যুকন্যা বলিয়া বিবেচনা হয় না। দস্যুগৃহে কি এরূপ সংসার ললামভূতা রমণী রত্নের উদ্ভব হইতে পারে ?—অথবা আশ্চর্য্য নহে। যদি শুক্তিগর্ভে বহুমূল্য মুক্তার উৎপত্তি অসম্ভব না হয়, তবে ইহারাই বা নীচ দস্যু কন্যা না হইবে কেন। যুবতীদ্বয়কে যতই দেখিতেছি, হৃদয় ততই আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইতেছে। ইহাদের হাতে ছার প্রাণ যায় যাউক, কিন্তু নয়ন মন সার্থক হইল। ধন্য বিধাতার সমাবেশ জীবনের মধ্যে এই নূতন দেখিলাম। ধন্য বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল।

সুরেন্দ্রের হৃদয় কিরূপ তাহা আমরা বুঝি না। যাহাতে মানব হৃদয় বিচলিত করে, তাহা তাহার হৃদয়ে কঠিন ধৈর্য্যাবরণে আবৃত ছিল, আজ সে আবরণ সরিয়া পড়িল—মনোবেগ সংযত করিতে পারিল না।

মানসিক ভাব অরুচিকর হইলেই বা ক্ষতি কি! সে ত কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করে নাই। বহুমূল্য হীরক মধ্যে কি হলাহল নাই? তবে সে মনুষ্য হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? যাঁহারা সংসারে—যাঁহাদের হৃদয়ে এখনও ভোগ বিলাস নিয়ত বলবতী রহিয়াছে, বৃদ্ধ হইলেও তাঁহারা কি মনোমধ্যে অরুচিকর নিন্দনীয় কোন বিষয় ক্ষণমাত্রও কল্পনা করেন না ?

সুরেন্দ্র ভাবিল যদি ক্ষণমাত্র ইহাদের দাসত্বও করিতে পারিতাম তাহা হইলেও চিরজীবনের মত ধন্য হইতাম। অদৃষ্টে

যাহাই থাক, ইহাদের সহিত ক্ষণেক রহস্যালাপ করিব। যেমনই হউক, উহারা ত দুর্ব্বলা রমণী—উহাদিগকে ভয় করিব কেন? ভয় ত মৃত্যুর—সুরেন্দ্র স্বচ্ছন্দে মরিতে প্রস্তুত। এইরূপ ভাবিতে অনেক বিলম্ব হইল। রজনী কথার কোন উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার বলিল "বন্দী। তোমার পরিচয় চাহিতেছি—নীরবে রহিলে কেন?"

সুরেন্দ্র বলিল "কৈ আপনারাত আমার পরিচয় চাহেন নাই?"

রজনী বলিল "সাবধান বন্দী, মিথ্যা বলিও না,—এ দরবারে মিথ্যা বলিলে এখনি সাজা পাইবে।"

সুরেন্দ্র। তবে বোধ হয় আমি শুনিতে পাই নাই।

রজনী। এ অপরাধে দণ্ড হওয়াই উচিত।

সুরেন্দ্র। উচিত হয় আদেশ করুন, কুসুমাঘাত অসহনীয় হইলেও যার পর নাই তৃপ্তিকর।

রজনী শতদলের দিকে চাহিয়া বলিল "বন্দী দেখছি বড় সুরসিক, দোষ সাব্যস্ত হইলে ইহাকে দণ্ড দিতে যে প্রাণে ব্যথা লাগিবে।"

শতদল একটু হাসিয়া বলিল "রসিক অপরাধীর জন্য অন্তরূপ দণ্ডেরও ত ব্যবস্থা আছে।"

সুরেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল "বোধ হয় তবে সোণার ফাঁসীরই ব্যবস্থা হইবে।

রজনী সুরেন্দ্রের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল "তুমি কি জাতি?"

সুরেন্দ্র। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন।

রজনী। বোধ হয় তুমি বিধর্ম্মী মুসলমান।

সুরেন্দ্র। যে আজ্ঞা তবে মুসলমান।

রজনী ডাকিল "জল্লাদ!"

বাহিরে শব্দ হইল "হুজুর!"

রজনী। বন্দীদ্বয় পরিচয় দিল না, ইহাদিগকে লইয়া এই দণ্ডে ফাঁসী দাও।

সুরেন্দ্র ভয় পাইল না। কৃষ্ণানন্দ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল "ওগো মা ঠাকরুণ রা! তোমাদের পায়ে পড়ি—ফাঁসী দিও না, আমরা মুসলমান নই—হিন্দু।

রজনী। ভাল কি জাতি?

কৃষ্ণানন্দ। ওগো উনি ব্রাহ্মণ, আর আমি সংগোপ।

রজনী। নাম কি?

কৃষ্ণানন্দ। ওঁর নাম সুরেন্দ্র, আমার নাম কৃষ্ণানন্দ ঘোষ।

রজনী। যদি তোমরা মুসলমান না হও তবে ভিক্ষা করিলে প্রাণ পাইতে পার।

কৃষ্ণানন্দ জীবন ভিক্ষা করিল। রজনীর আদেশে জনৈক অনুচর তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিল।

রজনী সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার ইচ্ছায় কি?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ইচ্ছা করিয়া কে আর মরিতে চায়? দয়া হয় জীবন রক্ষা করুন, ভিক্ষা আমাদিগের ধর্ম্ম নহে—ভিক্ষা কেন করিব?"

রজনী শতদলের গা টিপিয়া বলিল, "বহিন্ শোন কথা প্রাণ দিবে তবু ভিক্ষা করিবে না।"

শতদল ঈষৎ হাসিয়া বলিল "ব্রাহ্মণের—ভিক্ষায় লজ্জা কি? যদি জীবন রাখিবার ইচ্ছা থাকে, আর ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ

করে তবে জীবনের মূল্য ধরিয়া দিক না!—ও জীবন ত এখন তোমার, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

রজনী। ও ব্যক্তি এখানে মূল্য কোথায় পাইবে? তুমি কিনিয়া লও না—ভাল করিয়া ঘর সাজাইবে।

শতদল। মূল্য দিতে পারিবে না, তা ত বলে নাই।

রজনী। কি ব্রাহ্মণ! মূল্য দিতে পারিবে?

সুরেন্দ্র। পারিবে না কেন? তবে চোরা জিনিষ বলিয়া দাম পূরা পাইবে না।

শতদল একটু হাসিয়া ঘাড় নোওয়াইল।

রজনী বলিল, "তোমার ন্যায্য জীবনের কি মূল্য হইতে পারে।"

সুরেন্দ্র বলিল, আপনাদের বস্তু—আপনারা অগ্রে মূল্য না বলিলে ক্রেতার সাধ্য কি যে আপনাদের উপর দর দিবে।" "তবে তোমারও বলিয়া কাজ নাই—আমিও বলিতে চাহি না, আমার এই বহিন্‌কে মধ্যস্থ মানিলাম।" এই কথা বলিয়া রজনী শতদলের দিকে চাহিয়া বলিল, বহিন্‌, তুমিই যেন কিনিতেছ—বল বন্দীকে কি মূল্য দিয়া কিনিতে পার?"

শতদল বলিল, "আমাকে মধ্যস্থ মানিলে, এক পক্ষের নিশ্চয় ঠকা হইবে। আমি দর যদি ন্যায্য বলি তাহা হইলে তোমার কাছে আমাকে চির দিন গঞ্জনা সহিতে হইবে—বলিবে, "আমার এত বেশী টাকা হইত—তোমাকে মধ্যস্থ মানিয়া আমার এত দাম কম হইল। আর যদি অন্যায্য বলি তাহা হইলে বন্দী মনে করিবে, আমার এত টাকা দস্যুতে চক্ষে ধূলা দিয়া লইল।

রজনী। তুমি প্রকৃত ন্যায্য বল, তাহাতে কেহই তোমাকে গঞ্জনা দিবে না। সুরেন্দ্র শতদলের দিকে একটিবার চাহিয়া বলিল "দেখিবেন উৎসর্গ করা জিনিষ"—বুঝিয়া দর করিবেন।

রজনী ঈষৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া বলিল, তুমি কথা কহিতেছ কেন চুপ করিয়া থাক।

শতদল বলিল, "যদি নগদ দাম দিতে হয় তাহা হইলে বড় জোর চারি কড়া কাণা কড়ি—আর ধারে হইলে তাহার উপর এক কড়া বেশী।

রজনী বলিল "বন্দী। এই ত তোমার মূল্য নিরূপিত হইল এখন যাতে রাজী হও—চারি কড়া কড়ি দিলেই তোমার খালাস।"

সুরেন্দ্র। কড়ি ত আমার কাছে নাই।

রজনী। ধার কর।

সুরেন্দ্র। কে ধার দিবে?

রজনী। কাছেই মহাজন আছে।

সুরেন্দ্র। অনুগ্রহ করিয়া তবে ধার দিন।

রজনী। দেখ শুধু হাতে তাহা পাইবে না—অগ্রে খত লিখ। শতদলকে বলিল "কেমন বহিন্—তুমি ধার দিবে?"

শতদল। আমিত ধারের কারবার এখন তুলিয়া দিয়াছি: ধার দিলে শেষ পর্য্যন্ত করার মনে থাকে না। মহাজনী কাজে আমার অনেক বিলাত পড়িয়া গিয়াছে—নাজাইও বিস্তর পড়িয়াছে।—তবে দিতে পারি, যদি তুমি ইহার দায়ী হও।

রজনী। দায়ী কেমন?

শতদল। আমি তিন দিনের বেশী টাকা ফেলিয়া রাখিব না—বন্দী না দেয়—তোমাকে উহা আদায় করিয়া দিতে হইবে।

রজনী। তবে মেয়াদি খৎ লিখিয়া দও। তিন দিনের মধ্যে

যদি দিতে পারে তবেই খালাস পাইবে—না পারে তখন আবার তোমার অধীনে আসিবে—বন্দী তোমারই কেনা হইবে। সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল "কেমন এ প্রস্তাবে স্বীকার ত?"

সুরেন্দ্র। তাতে ক্ষতি কি?

রজনী। শতদলকে বলিল "তবে তুমি বন্দীর দাম মিটাইয়া দাও।"

শতদল। বলিল "আমার ত কাছে কাণা কড়ি নাই।"

রজনী। "না হয় তুমি ভাল কড়িই চারি কড়া দিলে।"

শতদল একটু ঘাড় বাঁকাইয়া নয়ন ভঙ্গি করিয়া বলিল "যাহা মূল্য নহে তাহা কেন আমি দিব? তাহা হইলে লোকের কাছে বলিবে খুব ঠকাইয়াছি।"

রজনী পূর্ব্ব হইতে একখানি খৎ লিখিয়া রাখিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে সেই লিখিত খৎখানি বাহির করিয়া সুরেন্দ্রকে সহি করিতে বলিল।

সুরেন্দ্রও একটু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সহি করিল!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রজনী বলিল "এখন তুমি যাইতে পার।"

সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দ তখনকার মত বিদায় হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর দেখে কাঁপে কায়,
পুত্র মাতা হাসিমুখে পুত্রমুণ্ড খায়।

ভৌতিক কাণ্ড।

সুরেন্দ্র এবং কৃষ্ণানন্দ কারামুক্ত হইয়া বাটী আসিতেছে তাহাদের চিন্তার অবধি নাই। কখনও ভাবিতেছে দুরাদৃষ্ট বশতঃ এত কষ্ট করিলাম যদি বিপ্রদাসের সাক্ষাৎ পাইতাম তাহা হইলেও এ কষ্ট সার্থক হইত। কখনও বা ভাবিতেছে আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়িয়াছি শ্মশান-বাসিনী, শরৎ এরা কি না খাইয়া আজও জীবিত আছে? বাড়ী গিয়া হয়ত তাহাদিগকে আর জন্মের মত দেখিতে পাইব না। কখনও ভাবিতেছে, না হয় আবার দস্যু কন্যাদ্বয়ের নিকট ফিরিয়া যাই! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রায় বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, পথের ধারে একটি তরুতলে বসিয়া দুইটী পথিক শ্রান্তি দুর করিতেছে। তাহারাও ক্ষনেক বিশ্রাম জন্য উভয়ে সেই স্থানে দাঁড়াইল! পথিকদ্বয় সুরেন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

নানাবিধ কথোপকথনের পর দুর্ভিক্ষের কথা উঠিল। প্রথম পথিক বলিল "মহাশয়! অনেকবার ভয়ানক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, অন্নাভাবে অনেকে বৃক্ষের পাতা পর্য্যন্ত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে দেখিয়াছি কিন্তু এমনতর কেহই নরমাংস ভক্ষণ করে নাই। আজ বর্দ্ধমানে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ভয়ঙ্কর একটা পৈশাচিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম।

সুরেন্দ্রের পত্নী তাহার একটী শিশুপুত্রকে নিজে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। শুনিলাম সুরেন্দ্র দুর্ভিক্ষে তাহাদিগের আহার যোগাইতে না পারিয়া তিন দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে রমণীটি বোধ হয় ক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা না হইলে এরূপ প্রবৃত্তি জন্মাইত না।

কথা সুরেন্দ্রের ভালরূপ বিশ্বাস হইল না। ভাবিল বোধ হয় কোনও দুষ্ট লোকে ইহা মিথ্যা রটাইয়াছে। তত্রাচ নানারূপ সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসিল "মহাশয়! এ ঘটনা কি আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন সত্য বলিতেছেন না কোনও লোকের মুখে শুনিয়াছেন।"

পথিক উত্তর করিল "আমি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়াছি—অনেক-কেই এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিবার জন্য তাঁহার বাটিতে উপস্থিত হইয়াছিল।" আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি।

পথিকের এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল মুখমণ্ডল অতিশয় বিবর্ণ হইল, জিহ্বা তালু ও অধরোষ্ঠ শুকাইয়া গেল। আর সেখানে বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণানন্দের সহিত দ্রুত-পদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুরেন্দ্র বর্দ্ধমানে গিয়া পঁহুছিল। বাটী প্রবেশ করিতে উহার যেন দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বাটীতে মনুষ্য বাসের চিহ্ন কিছুই দেখিতে পায় না। প্রাঙ্গণ ধূলি মৃত্তিকায় পরি পূর্ণ—কালিহাঁড়ি ছাগ-বিষ্ঠা ও খড় কুটায় অপরিচ্ছন্ন। গৃহাভ্যন্তরে কেবল ধূম উড়িতেছে, তখন বিকট দুর্গন্ধও পাওয়া যাই-তেছে—গন্ধটা যেন শবদাহের।

সুরেন্দ্র ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে আপন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু তিষ্ঠিতে পারিল না। "কি ভয়ানক, কি ভয়ানক" বলিয়া

পিছাইয়া একবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় শুকাইয়াছে, হস্ত পদ সতত কাঁপিতেছে, মস্তক থাকিয়া থাকিয়া ঘুরিতেছে। বাহির হইতেই ডাকিয়া বলিল "শ্মশান-বাসিনী? হায় এমন দৃশুও আমাকে দেখাইলে। ছি ছি ছি! গৃহ মধ্যে সুরেন্দ্র দেখিতেছে কি—প্রজ্বলিত বহ্নি—চিতার ন্যায় ভীষণ প্রজ্বলিত বহ্নি। সেই বহ্নিতে পুড়িতেছে সুরেন্দ্রের পর্য্যঙ্ক, বিছানা, মাদুর, বালিশ, বস্ত্র—গৃহের প্রায় তাবৎ দ্রব্যই পুড়িতেছে, আর পুড়িতেছে কি—একটী চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক অপগণ্ড শিশুটী। শিশুটির ক্ষুদ্র মস্তক বাহু এবং বক্ষঃ অগ্নির ভিতরে পড়িয়াছে, পা দুখানিও কোটীর কিয়দংশ বাহিরে পড়িয়া আছে, তখন পর্য্যন্ত তাহা দগ্ধ হয় নাই।

কেবল ইহাই নহে—আরও দেখিল, এক ভীষণ মূর্ত্তি অতি বিভীষণা রমণী—যেন সাক্ষাৎ পিশাচী—ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সহচরী! তাহার মস্তকের তৈলহীন কেশরাশি অতি বিশৃঙ্খল। কতক পৃষ্ঠের উপর আছে, কতক সম্মুখের দিকে অংশোপরি পড়িয়া বিকট মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছে। সেই কেশরাশির ভিতর দিয়া তাহার শ্বেতবর্ণ বিকট দশনপংক্তি ভীষণ দেখা যাইতেছে। দেহ অস্থি চর্ম্মাবিশিষ্ট—প্রায় উলঙ্গ বলিলেই হয়। একখানি শুষ্ক কদলী পত্রে কটিদেশকে ঢাকিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে খড়ি উড়িতেছে।

সুরেন্দ্র কেবল তাহার এইরূপ ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়াই চমকে নাই। সেই অগ্নির নিকট বসিয়া এক লোমহর্ষণ কার্য্য করিতেছে—শিশু অনলে পুড়িতেছে, তাহার গলিত উত্তপ্ত মাংস সকল ছিঁড়িয়া একটী মৃৎপাত্রে রাখিতেছে, ফুদিয়া ঠাণ্ডা করিতেছে ও বিকটাবদনে চর্ব্বন করিতেছে—আর আপন মনে

বলিতেছে—"হায় কি করিলাম!—কি হইল!—তেমন সোণার সংসার—সোণার স্বামী কোথায় গেল। না হয় ভাগ্যদোষে স্বামীই গেল, ছেলেটাকেই বা স্বহস্তে মারিলাম কেন! বুক যায়—বুক কাঁদিয়া শতধা ফেটে যায়। বাছা আমার ধুলায় কাতর হইয়া কাঁদিয়া একমুঠা মুড়ি চাহিয়াছিল, আমি তাহা দিই নাই—লোকে কাতর দেখিয়া দয়া করিয়া দিয়াছিল, আমি মায়া-হীনা রাক্ষসী—বাছার হাত হইতে ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়া নিজের উদর পুরাইয়াছিলাম। আনি স্বচ্ছন্দে খাইতে লাগিলাম, বাছা আমার সজল নয়নে মুখপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আমি মা নহি—আমি রাক্ষসী!" রমণী চোকের জল মুছিয়া আবার বলিল।

"কেন, বেশ ত করিয়াছি ভালই হইয়াছে; ছেলেটা ক্ষুধায় দগ্ধিয়া মরিতেছিল তারে একেবারে মারিয়াছি, সে এখন জুড়াই-য়াছে—আমিও জুড়াইয়াছি—পায়ের বেড়ি ঘুচিয়াছে। এটা কি আমার পাষাণীর মত কাজ হইয়াছে? না না—পেটের সন্তান তারে ফেলিব কোথায়—পেটেই থাক।"

সুরেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইয়া আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রমণী দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "এই যে আমার সোণার চাঁদ! এসেছ? এত দিন কোথা ছিলে মণি?"

তাহার অঙ্গ ভঙ্গি ও কথাবার্ত্তার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, রমণী আবার বলিল—

"ভয় কি প্রাণেশ; আমি কিঙ্করীহে তব—
ক্ষণেক দাঁড়াও, কিছু শেষ কথা কব!"

সেই প্রাণ—সেই দেহ আছয়ে আমার,
কাল দোষে হায় নাথ অস্থি চর্ম্ম সার।
বিকৃত স্বভাব শুধু অন্নের অভাবে,
নিকটে আসিতে কেন এত ভয় তবে?
সেই হাসি সেই মুখ—রয়েছে সকলি,
দুর্দ্দশার হেতু হায় রূপ গেছে চলি—
রূপের সাগরে ভাসে পুরুষের মন।
"তুমি মম—আমি তব" অলীক বচন!
এক প্রাণ হয়ে বসিতাম দুই জনে,
কত কথা বলিতে হে আছে আজো মনে।
জীবন সঙ্গিনী মম তুমি চন্দ্রাননে!
যে দিন বিরহ হবে মরণ সেদিনে।
কার তরে প্রাণেশ্বর! চোকে ফেল জল?
স্বার্থ বিনা ভালবাসা সংসারে বিরল—
যোগীগণ যোগমগ্ন স্বার্থের কারণ,
জনক জননী করে সন্তান পালন।
তোমার আমার তাই বিবাহ বন্ধন,
স্বার্থ নাহি বুঝে ভবে হেন কয় জন?
বাঁচিতে হে নাহি সাধ—যদি বাঁচি প্রাণে,
কভু ভাল বাসিবে না পুরুষ কঠিনে!
আরো বলি—কোন্ প্রাণে বিপদ দেখিয়া,
পলাইলে ফেলি নিজ স্ত্রী পুত্রের মায়া।
ভার্য্যার বিলাপ আর পুত্রের ক্রন্দন,
অসহ্য যদ্যপি নাথ হৈল এমন;
বক্ষঃ চিরি হৃৎপিণ্ড কেন না অর্পিলে—

সন্তানে ধরিয়া বুকে কেন না মরিলে ?
উদরে ধরিতে যদি বুঝিতে বেদনা,
কেমনে ত্যজিয়া যেতে যেতো ভাল জানা।

উন্মাদিনী রমণী এই কথা বলিয়া আবার বিকট হাস্য করিয়া উঠিল—বলিল, "উদরের জ্বালা বড় জ্বালা—জীয়ন্ত ছেলেটাকে পোড়াইলাম, মা হইয়া আধ খানা খাইয়া ফেলিলাম, তবুও পোড়া পেট পুরিতেছে না।"

সুরেন্দ্র উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "শ্মশান-বাসিনী! হা পাপীয়সি, তুমি মরিলে না কেন ?—যদি অনাহার এতই অসহ্য হইল—তবে মরিবার কি আর উপায় ছিল না ?—হাস্য মুখে বিষ খাইলে না কেন ?—আনন্দচিত্তে জলে ডুবিলে না কেন ?—চিতানলে দুষ্ট ক্ষুধানল মিশালে না কেন ? পেটের সন্তান শরৎ—তাহাকে হা—রাক্ষসী—শ্মশান-বাসিনী।—"

সুরেন্দ্র আর কথা কহিতে পারিল না—কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল তৎসঙ্গে চৈতন্যও লোপ পাইল।

বিভীষণা রমণী বলিল—এক প্রকার খোনা কথায় গন্ গন্ করিয়া বলিল, "কেবল মুখেই চাঁদ ভালবাসা জানাও। যদি শ্মশান-বাসিনী বলিয়া আমায় চিনিতেই পারিলে, তবে এখনও কিছুই খাইতে দিতেছ না কেন ? আমি যে ক্ষুধায় মরিলাম। পতি সম্মুখে থাকিয়া ধর্ম্মপত্নী হত্যা দেখিবে ?"

সুরেন্দ্র ক্রোধিত হইয়া বলিল, "আর ও ঘৃণিত জীবন রাখিয়া কাজ নাই—মরিয়া যাও, বাঁচিয়া থাকিলে লোকের কাছেও মুখ দেখাইবে কিরূপে ? পেটের জ্বালায় তোমার এ প্রবৃত্তি হইবে তাহা ভ্রমেও জানিতাম না। এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্র বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অপর একটি কক্ষে সহসা একটা

হাস্যের তরঙ্গ উঠিল। "হা হা, হো হো, হি হি" বিকট শব্দে গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল—আবার এক জন ভীমা—রমণী। ইহারাও সেই বেশ—সেই ভয়জনক বেশ ভূষা—সেইরূপ বিকট অবয়ব। বেশীর মধ্যে কেবল বিকট—হাস্য। ত্বরিতপদে সুরেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—হাসিতে হাসিতে চোক মুখ ঘুরাইয়া বলিল "ওগো—ও শ্মশান-বাসিনী নয়—আমিই সেই।"

"মরণ,—অভাগ্যি। পেটের জ্বালায় পরের জিনিষে তোর এত লোভ! আমার সতীন হইতে চাহিতেছিস্—তোর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব।" এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণী একখনি জ্বলন্ত খাটের পায়া উঠাইয়া লইল। এ বলে "শ্মশান-বাসিনী ও বলে আমি শ্মশান-বাসিনী।" এইরূপে উভয়ে ঘোরতর বাকযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েরই কেমন এক রকম নাকি স্বর গন্ গন্ শব্দে সেই গৃহ পরিপূর্ণ হইল। শেষে ঘোর সংগ্রাম—পৈশাচিক সংগ্রাম! এ উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কামড়াইল, ও উহাকে তদ্রূপ কামড়াইয়া দেহের মাংস কাটিয়া লইল। আঁচড় কামড়ে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইল। কাহারও শরীরে একবিন্দু রক্ত নাই। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া উভয়েই তথায় প্রাণ ত্যাগ করিল।

সুরেন্দ্র এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া এই সকল ভৌতিক কাণ্ড অবলোকন করিতেছিল। যখন তাহারা উভয়ে মরিয়া গেল, তখন সুরেন্দ্রও মূর্চ্ছিত হইয়া সেই রমণী না পিশাচীদ্বয়ের মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"ধনলোভ বড় লোভ যাহার কারণ,
মনুষ্য হইয়া করে পশু আচরণ।

যাদব সংহার।

প্রিয় পাঠক মহাশয়! সুরেন্দ্র যাহাদিগকে আপন গৃহমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বিস্ময়ে ও ভয়ে তথায় মুর্চ্ছিত হইল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ শ্মশান-বাসিনী বা শরৎ নহে। শরৎকে হারাইয়া শ্মশান-বাসিনী এক্ষণে বিপ্রদাসের আশ্রমে কালাতিপাত করিতেছে। শরৎ কমলা ঠাকুরাণীর এখন প্রধান শীকার হইয়াছে। কমলা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য তাহাকে আজ হত্যা করিতে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছে।

বোধ হয় আপনি একটা যকের প্রবাদ কথা শুনিয়া থাকিবেন। যাহারা অর্থ পিশাচ—ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় না করিয়া দীন দরিদ্রের উপকার না করিয়া—নিজ পেটে না খাইয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, যক্ষস্থাপন বা যক দেওয়া তাহাদিগেরই কার্য্য। শুনিতে পাওয়া যায়, সম্পত্তি ভোগ করিবার লোক না থাকিলে সে কালে কৃপণেরা একটি মাত্র যক্ষ স্থাপন করিত। যক্ষ স্থাপন করিলে সেই সকল সম্পত্তি পর জন্মে পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখে ভোগ করিতে পায়, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল।

পূর্ব্বে যে কমলা ঠাকুরাণীর কথা বলিয়াছি, তাহাকে ঐ সকল কৃপণ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারও

প্রচুর সম্পত্তি—ব্যয় নাই বা ভোগ করিবারও লোক নাই, এজন্য বহুদিন হইতে যক্ষস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালকের অভাবে তাহার ঐ কার্য্যটী এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কেবল পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইলেও সে কার্য্য হয় না —যে বালক আবার তাহার মাতার একটী মাত্র সন্তান, এবং শনিবারে অমাবস্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে যক্ষস্থাপন কার্য্যে সেই বালকই শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বে যে যাদবের কথা বলিয়াছি সে কমলার প্রিয় শিষ্য। এই জন্য সে সকল সময়ে প্রাণ দিয়াও তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে। কমলার কোনও গোপনীর কথা যাদবের কর্ণগোচর হইলে কখনও তাহা প্রকাশ করিত না, কমলাও তাহার নিকট অনেক মনের কথা খুলিয়া বলিত। একদিন তাহাকে কথায় কথায় বলিয়াছিল, পাঁচ ছয় বছরের একটী শিশু পাইলে তাহাকেই লইয়া প্রতিপালন করি। সরল প্রকৃতি যাদব—"মা ঠাকরুণের আবশ্যক" এই মনে করিয়া সেইরূপ শিশুর মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান করিত। বহুদিন পরে তাহার সে আশা সফল হইয়াছিল। কমলাকে আসিয়া সংবাদ দিল, সে যাহা চাহে তাহার সন্ধান করিয়াছি। সে শিশু অপর কেহ নহে, সুরেন্দ্রের পুত্র শরৎ।

অভিলষিত বস্তু সন্ধান পাইয়া কমলা হৃষ্টান্তঃকরণে যাদবকে আশীর্ব্বাদ করিল, যাদব পদধূলি লইল।

কমলা বলিল, "যাদব! আর একটী কাজ করিয়া দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

যাদব সকল কার্য্যেই তৎপর, বলিল, "কি করিতে হইবে?"

কমলা বলিল, "গৃহের পেছনকার ঐ জঙ্গলের ভিতরটা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দে।"

যাদব তৎক্ষণাৎ কোমর বাঁধিয়া একখান কোদাল ঘাড়ে করিয়া জঙ্গলে ঢুকিল। জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে কমলা গিয়া একটী তুলসী মঞ্চ দেখাইয়া বলিল, "ইহার মাথাটা ধরিয়া জোরে টান দে।"

যাদব তুলসী মঞ্চের মাথা ধরিয়া সজোরে টানিল, যাদবের টানে তাহা তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসিল।

বুঝা গেল সেই মঞ্চের দ্বারায় একটী গহ্বরের মুখ আবৃত ছিল, এক্ষণে তাহা সরিয়া আসাতে একটা গহ্বর বাহির হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া যাদব জিজ্ঞাসিল, "মা ঠাকরুণ! এটা কি পাতকোয়া নাকি গো?"

কমলা বলিল "না না ওটা পাতাল ঘর। দেখিতেছিস্ না ইহাতে ঐ নামিবার সিঁড়ি রহিয়াছে?

যাদব সিঁড়ি দেখিতে পাইল। কমলা বলিল, "এই সিঁড়ি দিয়া তুই নামিয়া ভিতরে একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া আয়।"

যাদব তৎক্ষণাৎ গহ্বরে নামিয়া তন্মধ্যস্থ একটী ঘর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া আসিল। কমলা বলিল, "আর একটী কাজ বাকি আছে, আমার সঙ্গে আয় দেখি।" যাদব কমলার অনুগমন করিল।

কমলা নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক স্থান খনন করিতে বলিল। যাদব "টাকা উপড়াইবে নাকি?" এই বলিয়া দাঁতখামটী করিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। প্রায় পাঁচ ছয় হাত খনিত হইয়াছে, "ঠং" করিয়া একটা শব্দ হইল।

কমলা বলিল, "এইবার পাশ খোঁড়।"

যাদব খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকরুণ! একটা বড় কলসী।"

কমলা বলিল "চুপ! আরও আছে,—খোঁড়,—ওটা আমাকে তুলিয়া দে।"

যাদব প্রথম কলস তুলিয়া দিয়া আবার খনন করিতে আরম্ভ করিল,—আবার পাইল। এক একটী কহিয়া ক্রমান্বয়ে সাতটী কলস উঠাইল। কমলা কলসগুলি স্বয়ং লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত গৃহে স্থাপিত করিল।

যাদব গহ্বরের ভিতরে হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ! আর আছে—না আমি উঠিয়া যাইব ?"

কমলার এখন যাদবকে মনে মনে বড় বিশ্বাস হইতেছে না। ভাবিল, "এ সমস্ত সম্পত্তি দেখিতে পাইল, রাত্রিতে আসিয়া যদি আমার গলা টিপিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই করিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া যাদবকে কিছু উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে একখানি তক্তা আনিয়া গহ্বরের মুখে ফেলিয়া দিল এবং তাহার উপর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যাদব গহ্বরের ভিতর হইতে বলিল, "ওকি মা ঠাকরুণ! তক্তা ঢাকা দাও কেন ? আমি যে এখনও ভিতরে রহিয়াছি ; দাঁড়াও—আগে উঠিয়া যাই।"

কমলা বলিল, "মুখপোড়া—আর তুই উঠিবি কোথায় ? মনে করিয়াছিস্, বামণীর টাকার সন্ধান পাইলাম—লইয়া যাইব ? আর লইতে হইবে না—জন্মের মত গর্ত্তের মধ্যেই থাক।"

যাদব একবার ভাবিল, "মা ঠাকরুণ হয়ত তামাসা করিতেছে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যখন উঠাইল না—গরমে প্রাণ যায় যায় হইল ; দেহে ঘর্ম্ম বহিল, তখন বুঝিতে পারিল তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে লোক জানাইবার ইচ্ছায় বিকট চিৎকার করিল,—উঠিবার জন্য বল প্রকাশ করিল,—প্রাণের যাতনায় অনেক হাঁচড়পাঁচড় করিল,—কাকুতি মিনতি করিল,—শেষে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পাষাণ-

হৃদয়া কমলার দয়া হইল না। গর্ত্তমধ্যে হাঁপাইয়া যাদব প্রাণ ত্যাগ করিল। কমলা তৎক্ষণাৎ খনিত মৃত্তিকার দ্বারায় গহ্বর ভরাট করিয়া ফেলিল।

শিষ্য যাদবকে জীবান্ত সমাহিত করিয়া কমলা এইবার বালকটিকে আনিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিধাতা বিমুখ যারে,
কোথা সুখ তার?

বিপৎ পাৎ।

এ জগতের দুষ্টলোকের ছলের অভাব নাই। পাপিষ্ঠা কমলা শরৎকে চুরি করিবার জন্য সুরেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া মায়াজাল বিস্তার করিল। শ্মশান-বাসিনী তাহাকে চিনিল না, পরিচয় দিয়া বুঝাইয়া দিল, সে সুরেন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভগ্নি—নাম দশভূজা।

দশভূজা কুশল জিজ্ঞাসিল, শ্মশান-বাসিনী প্রণত হইয়া বলিল, সকলে ভাল আছে। মার দেখা দেখি শরৎও প্রণাম করিল।

দশভূজা-রূপিনী রাক্ষসী কমলা তাড়াতাড়ি শরৎকে কোলে তুলিয়া লইল, আশীর্ব্বাদ করিল, মুখচুম্বন করিল। এক হাতে একটি পুতুল ও অপর হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিল, "বাবা! আমাকে চিনিয়াছ?"

শরৎ বলিল, "চিনিয়াছি।"

কমলা বলিল "আমি কে বল দেখি?"

শরৎ বলিতে না পারিয়া শ্মশান-বাসিনীর মুখ পানে চাহিল।

শ্মশান-বাসিনী বলিয়া দিল "তোমার পিসী মা।"

দশভূজা কথনও ভ্রাতার বাটিতে আইসে নাই, এই জন্ত একটু জাঁক জমকের সহিত আসিয়াছে। শরতের জন্ত থালা ভরিয়া সন্দেশ আনিয়াছে, ভারে করিয়া এক ভার মৎস্ত আনিয়াছে, বাক্‌স সাজাইয়া পুতুল আনিয়াছে—কত কি আনিয়াছে। শরৎ এক হাতে একটী পুতুল, অপর হাতে একটী সন্দেশ পাইয়া পিসির কোলে উঠিয়া কতমত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। শরতের মুখে হাসি দেখিয়া শ্মশান-বাসিনীর আনন্দের সীমা নাই।

কমলা একবার এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, "সুরেন্দ্র কোথায়?"

শ্মশান-বসিনী বলিল, "তিনি এই মাত্র বাটী হইতে কোথায় বাহির হইয়া গেলেন?"

এই সময়ে কমলা একটু ননদ নাড়া দিয়া বলিল, "বলি হাঁগা বউ! এই অকালের বছর এতদূর কষ্ট হ'য়েছে, একটিবার খবরও পাঠাতে নাই কি? আমি না হয় একা—সরবার নড়বার যোটি নাই, সুরেনেরও ত একবার খপর নিতে হয়—দিদি বাঁচলো কি মলো! আর সুরেনই বা কেমন ক'রে জানবে—বাবা এদানি ত সেখানে যেতেন না। শুনেছিলাম

বিবাহের পর একটী বার গিয়াছিলেন সেই খানেই তাঁর প্রথম বিবাহ। তার পর কত জায়গায় বিবাহ করে ছিলেন, সেখানকার কথা হয় ত মনে ছিল না। মনে থাকলে কি সুরেন শুনতে পে'ত না।"

শ্মশান-বাসিনী বলিল, "বোধ হয় শুনেন নাই, শুনিলে অবশ্যই সংবাদ লইতেন।"

কমলা বলিল, "তা সংবাদ না নিক্। আপনার সামগ্রী যে যেখানে আছে বেঁচে থাক। তবে মনটা এক একবার কল্ কল্ করে উঠে—আমার বাড়ীতে চারটা গাই—দুধের সাগর বল্লেই হয়। ময়রা খাতক, জেলে প্রজা—জিনিষ পত্রের ছড়াছড়ি—খাবার লোক নাই—সব পরেই খায়। আমার শরৎ সুরেন একরত্তি চোখে দেখতে পায় না। যদি শরৎকে সেখানে পাঠাও তাহ'লে সব সার্থক হয়। কষ্ট হ'য়েছে শুনে আমি শরৎকে নিতে এসেছি। আহা! বাচার আমার কত কষ্ট হ'য়েছে।" এই বলিয়া শরতের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

কমলার সকরুণ বাক্য শুনিয়া শ্মশান-বাসিনী ভাবিতে লাগিল "বাঁচিলাম—শরতের একটা উপায় হইল। দিদি শরৎকে এত ভাল বাসেন যে, এখানে উহার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি লইতে আসিয়াছেন—ওর নিকট শরৎ সুখে থাকিবে। তিনি বলিতেন, অন্নকষ্ট হইলে আত্মীয়ের শরণাগত হওয়া উচিত নয়, তাহাতে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তখন তাহা-দের পূর্ব্বভাব থাকে না। অন্নহীন ব্যক্তি কাহারও নিকট আদৃত হয় না। পূর্ব্বে যাহারা কাছে বসিয়া আলাপ করিয়াছে, এখন তাহারা তাহাকে দেখিলে পাছে কথা কহিতে হয়,

সেই ভয়ে অন্তর দিয়া চলিয়া যায়। আদর অভ্যর্থনা এ সমস্তই কেবল সম্পদ। ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, সকলেই সম্পদের অনুগত, সম্পদের সহিতই তাহাদের একমাত্র সম্বন্ধ। অন্নহীন ব্যক্তির বাক্যের মিষ্টতা প্রকাশ পায়না, সঙ্গত হইলেও তাহার হইয়া তখন কেহ কথা কহে না। ভাগ্যবানের অসঙ্গত বাক্যও আদরণীয় হয়। তিনি হয়ত সেই জন্যই এত দুঃসময়েও কাহারও দ্বারস্থ হয় নাই। কিন্তু দিদি বিপদ শুনিয়া আপনা হইতে আসিয়াছেন, শরতের কষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া কাঁদিতেছেন, ওঁর নিকট পাঠাইতে তিনি কখনই অসম্মত হইবেন না। দাদার নিকটে পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে বলিয়াছিলেন, তিনি কখন গৃহী, কখনও সন্ন্যাসী—কখন কোথায় থাকেন কোথায় যান তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। সেখানে পাঠাইয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিব না। কিন্তু আর শরতের কষ্ট দেখিতে পারি না। যে শরতকে মারিয়া ধরিয়া দুধ খাওয়াইতে হইত, ক্ষীর ছানা খাইতে মুখ বাঁকাইত, আজ সেই শরত, দুটী শাক সিদ্ধ খাইবার জন্য লালায়িত। যে শরতের মুখে সদাই হাসি লাগিয়া থাকিত, এখন তাহার একদণ্ড চক্ষের জলের বিরাম নাই। শরৎকে সুখী দেখিতে পাইলে সকল কষ্ট দূর হয়।” এই সকল নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া শরতকে তাহার সহিত পাঠাইতে সম্মত হইল, বলিল, দিদি শরতকে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমিও নিশ্চিন্ত হইব।”.

শ্মশান-বাসিনী একথা সামান্য দুঃখে বলে নাই। সে যে কষ্টে কয়েক দিন কাটাইয়াছে তাহা শুনিলে অতি পাষাণ হৃদয়েরও অশ্রুপাত হয়। যৎসামান্য আহার্য্য ছিল, তাহাতে

শরতেরই কয়েক দিনমাত্র অর্দ্ধাসন হইয়াছে, শ্মশান-বাসিনীর আজ পাঁচদিন আহার হয় নাই।

স্নেহময়ী জননীর ধার এজগতে কে শোধিতে পারে? লতিকা শুষ্ক হইলেও ক্রোড়স্থ ফল পরিত্যাগ করে না—একথা কয়জন বুঝে? মাতা মাতার কাজ করেন, আমরা সন্তানের কাজ করিতে পারি না। যদি সন্তানের কাজ করিতে হয়, তবে পুত্রের ধর্ম্ম কি?—একমাত্র স্নেহময়ী জননীর চরণ সেবা—ত্রিসন্ধ্যা তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।

শ্মশান-বাসিনী শরতকে পাঠাইতে সম্মত হইয়াছে দেখিয়া কমলা বলিল "বাবা শরত; তুমি পিসীর বাড়ী যাবে?"

শরৎ হাস্তমুখে বলিল, "যাব।"

কমলা। মার জন্য কাঁদিবে না ত বাবা?

শরৎ নূতন পিসী পাইয়াছে—পিসীর কোলে বসিতে পাইয়াছে—পুতুল পাইয়াছে—সন্দেশ পাইয়াছে, আহ্লাদে বলিল, "কাঁদিব না।"

কমলা বলিল "দেখ বউ, শরৎ আমাকে এক দিনেই চিনিয়াছে। তবে আমি লইয়া চলিলাম" এই বলিয়া তখনি যাইতে উদ্যত হইল।

শ্মশান-বাসিনী বলিল, "সেকি দিদি! আজই কি যায়? তিনি বাড়ীতে আস্থন—দেখা কর—দুদিন থাক। পরের মত এখনি চলিয়া যাইবে—তিনি কি মনে করিবেন?"

কমলা বলিল, "থাকবার যো আছে কি দিদি। বাড়ী ফেলিয়া আসিয়াছি; জিনিস পত্র সামলাইয়া আসি নাই, চোর ডাকাতের বড় উপদ্রপ—কেমন করিয়া থাকিব বল? আর এক দিন আসিয়া বরং দশ দিন থাকিব।"

শ্মশান-বাসিনী বলিল, "আজ যাইতে পাইবে না।"

কমলা বলিল, "তবে সব চোরে লইয়া যাক্—থাকিলে ত শরতেরই থাকিবে। আমার কি আর ধন ভোগ করিবার জন্ম আর কেহ লোক আছে?"

শ্মশান-বাসিনী তাহাতেও স্বীকৃত হইল না।

কমলা ভাবিতে লাগিল, "আর বিলম্ব করা হইবে না।" শুভকার্য্যে বিলম্ব করিলে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এখনি সুরেন্দ্র আসিয়া যদি চাতুরি বুঝিতে পারে তাহা হইলে হিতে নিশ্চয়ই বিপরীত হইবে।" এই ভাবিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী কাগজের মোড়ক খুলিল, তাহাতে কতকটা বিষ ছিল। কিঞ্চিৎ বিষ লইয়া শ্মশান-বাসিনীর হাতে দিয়া বলিল "বউ কথায় কথায় ভুলিয়া গিয়াছি আমি শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলাম, বৃন্দাবনচন্দ্রের চরণামৃত আনিয়াছি দেওয়া হয় নাই—ধর এইটুকু মুখে ফেলিয়া দাও।" শ্মশান বাসিনী ভক্তিভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া অগ্রে পুত্র মুখে তুলিয়া দিবার উপক্রম করিল। কমলা নিবারণ করিয়া বলিল, "ও চরণামৃত মাতাকে পুত্রের মুখে তুলিয়া দিতে নাই—আমি দিতেছি।" এই বলিয়া অপর একটু সন্দেশের গুঁড়া লইয়া শরতের মুখে দিল।

শরৎ খাইয়া বলিল, "চন্নামেত্তর বেশ মিষ্টি।"

শ্মশান-বাসিনীও তখন নিজের হস্তস্থিত সেই তীব্র বিষ চরণামৃত জ্ঞানে মুখে ফেলিয়া দিল।

যখন অতিশয় মাথা ঘুরিতে লাগিল, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন শ্মশান-বাসিনী বলিল, "দিদি। আমাকে তুমি কি খাওয়াইলে—আমার যে গা কেমন কেমন করিতেছে?" এই কথা বলিয়া ধূলার উপরে শুইয়া পড়িল।

কমলা বলিল, "চরণামৃতে ঐরূপই গা ঘুরে—এখনি ভাল হইবে। বিছানায় গিয়া শুইয়া থাক।"

শ্মশান বাসিনী তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। যখন অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল তখন একবার কমলাকে বলিল, "দিদি! হয়ত আমি আর বাঁচিব না। কমলা বলিল, "বালাই! ও কথা বলিতে নাই।" শ্মশান-বাসিনীর যেরূপ যন্ত্রণা হইতেছে তাহাতে সে বুঝিয়াছে এখনি নিশ্চয়ই তাহাকে মরিতে হইবে। কমলাকে বলিল, "দিদি! তুমি পথ চলিয়া আসিয়াছ, কত কষ্ট হইয়াছে। পা দুটী ধুয়াইবার অবসর পাইলাম না। আমি দুর্ভাগিনী শুইয়া রহিলাম—কি করি, উঠিবার শক্তি নাই। প্রাণ যায় শরৎকে দেখিও। আমি যাই—ক্ষতি নাই, উহার কষ্ট দেখিয়া চলিলাম, মরণে সুখ হইল না। এই বলিয়া শ্মশান বাসিনী চক্ষু মুদিত করিল।

কমলা পূর্ব্ব হইতেই পথের ধারে পাল্কী বেহারা ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। যেই দেখিল শ্মশান-বাসিনী অচেতনা হইয়াছে অমনি শরৎকে লইয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিল। বাহকগণ তৎক্ষণাৎ পাল্কী লইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

কমলা বাটি পঁহুছিয়া তিন দিন শরৎকে রাখিল। যখন যাহা খাইতে চাহিল তখনি তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিল। এক একবার মাতাকে দেখিবার জন্য যখন কাঁদিত, তখন নানারূপ কৌশল করিয়া ভুলাইয়া দিত। এইরূপে তিন দিন গত হইল, আজ তাহাকে লইয়া যক দিবে।

পাঠক! এইবার আপনাকে অশ্রু সংবরণ করিতে হইবে। নিরপরাধী শিশু শরতের বিপদ দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য্য ধরিতে হইবে।

যক্ষ দিবার প্রকরণ বড়ই হৃদয় বিদারক। একটী পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে সম্পত্তির সহিত জীয়ন্তে মৃত্তিকা মধ্যে সমাহিত করিতে হয়। সেই শিশু মরিয়া যক্ষ হয় এবং যাবৎ ধনাধিকারী নব দেহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ না করে তাবৎ তাহার ধন বহন করিতে থাকে। সে জন্মগ্রহণ করিলেই যক্ষ তাহার ধন তাহাকে প্রত্যর্পণ করে। সেই জন্য কমলা আজ সুরেন্দ্র এবং শ্মশান-বাসিনীর হৃদয় সর্ব্বস্ব ধনকে জীয়ন্তে প্রোথিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

কমলা তাহাকে আজ শেষের খাওয়া সাধ মিটাইয়া খাওয়াইয়াছে। শেষের দেখা—জগতের যাহা কিছু দেখিতে চাহিয়াছে সাধ মিটাইয়া দেখাইয়াছে। যাহা করিতে বলিয়াছে তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। কেবল শ্মশান-বাসিনীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, কমলা তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই। শেষের দিন একবার মা বলিয়া ডাকিতে পায় নাই। স্নেহময়ী জননীর আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শুনিতে পায় নাই।

রাক্ষসী তাহাকে লইয়া বেশ করিয়া তৈল মাখাইয়া—স্নান করাইল, নূতন বস্ত্র পরাইল—গলদেশে একগাছি ফুলের মালা দিল—দুই হাতে দুটী সন্দেশ দিল। শরৎ ফুলের মালা পরিয়া সন্দেশ খাইতে খাইতে আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, আর এক একবার বলিতে লাগিল, "পিসী। আমাকে যখন আমার মার কাছে লইয়া যাইবে তখন মাকে আমার এই রাঙ্গা ফুলের মালা গাছটি দেখাইব।"

"দেখাইও" বলিয়া কমলা তাহাকে ধরিল। শরৎ নাচিতেছিল, কমলা তাহার সে আনন্দ ভঙ্গ করিয়া ধরিল—পূর্ব্ব কথিত মত গুপ্ত গৃহের ভিতরে তাহাকে লইয়া গিয়া বসাইল—তাহার চারিদিকে অর্থের কলসগুলিও সাজাইয়া দিল এবং একটী

ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া বেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিল শরৎ দ্বারের নিকট আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে "পিসি মা পিসি মা কপাট খুলিয়া দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"মা! মা!" শব্দ করিয়া কত কাঁদিতে লাগিল—কমলা শুনিল না—তাহার পাষাণ হৃদয় টলিল না।

শরতের কুকুরটী কয়েকদিন তাহার সঙ্গেই ছিল। কমলা যেদিন শরৎকে চুরি করিয়া লইয়া যায় সে দিন সে বাহকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। হঠাৎ প্রভুর এই বিপদ দেখিয়া ঘোরতর রবে চীৎকার করিতে করিতে বাটির চারিদিকে ছুটাছুটী করিল, ব্যাকুল হইয়া কতবার কমলার পদ জড়াইয়া ধরিল কত চোকের জল ফেলিল। যখন কমলা কিছুই শুনিল না তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কণ্ঠদেশে এমন কামড়াইল যে, কমলা বেগে আর্ত্তনাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল ও ক্ষণকাল মধ্যেই সে প্রাণত্যাগ করিল।

কমলাকে দংশন করিয়া কুকুর জঙ্গলে ঢুকিল, হাঁচড় পাঁচড় করিয়া তুলসী মঞ্চটী ফেলিবার চেষ্টা করিল, যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না, তখন আর্ত্তস্বরে বিকট চীৎকার করিতে করিতে লোকের পায় পায় ঘুরিয়া বিপদ জানাইতে লাগিল দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলে কুকুরটা ক্ষেপিয়াছে মনে করিয়া তাহা হইতে সাবধান হইতে লাগিল। কেহ বা লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। সে তখন অনন্যোপায় হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বর্দ্ধমানাভিমুখে ছুটিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—(:০:)—

একবার হারাইয়ে অমূল্য রতন।
পুনঃ তারে পায় যেবা সেই মহাজন॥

পুত্রোদ্ধার।

যে সময়ে সুরেন্দ্র সেই অনশনক্লিষ্ট রমণীদ্বয়কে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া ভয়—বিস্ময় এবং শোকে হতচেতন হইল তাহার অনতি বিলম্বেই বিপ্রদাস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপ্রদাস সেই বিকট শ্মশান সদৃশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ কিয়ৎ কাল স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল "ব্যাপার কি। এদিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ওদিকে সুরেন্দ্র সংজ্ঞাশূন্য—স্পন্দহীন অবস্থায় শায়িত। রমণীদ্বয়কে দেখিয়া বোধ হইতেছে উহারা মৃত—সুরেন্দ্রও কি তবে জীবিত নাই?" মুহূর্ত্তমাত্র এইরূপ চিন্তা করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, সুরেন্দ্রের অল্প অল্প নিশ্বাস বহিতেছে। একটি বৃহদাকার কুকুর থাবা গাড়িয়া বসিয়া তাহার পদ লেহন করিতেছে। কুকুরটাও এইমাত্র কমলা ঠাকুরাণীর বাটী হইতে আসিয়াছে। সে সুরেন্দ্রকে বিপদের কথা জানাইবার চেষ্টা করিতেছিল, বিপ্রদাসকে দেখিয়া পদলেহন পরিত্যাগ করিল। একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পদলুণ্ঠন পূর্ব্বক নানারূপ ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিপ্রদাস সে দিকে তত মনোযোগ দিল না, বা দিবার সময়ও পাইল না। ব্যগ্রহাতিশয় সহকারে "সুরেন্দ্র—সুরেন্দ্র" বলিয়া দুই তিনবার ডাক দিল। যখন ডাকিয়া কোন উত্তর পাইল না, তথন স্পষ্টই বুঝিল তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছে।

বিপ্রদাস অনেক যত্ন তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল, চৈতন্য লাভ করিলে পর সুরেন্দ্র বিপ্রদাসকে জিজ্ঞাসিল, "আপনি কখন আসিয়াছেন ?"

বিপ্রদাস বলিল, "এইমাত্র—এ সকল ব্যাপার কি বল দেখি ?"

সুরেন্দ্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "সাক্ষাতে সমস্তই দেখিতেছেন, আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

বিপ্রদাস বিস্মিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ সুরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া কহিল, পরে বলিব, "কিছুই বুঝিলাম না।

সুরেন্দ্র কাতরস্বরে বলিল, "শ্মশান-বাসিনী এবং শরৎ জীবিত নাই ?"

বিপ্রদাস বলিল, "কিরূপে জানিলে ?"

সুরেন্দ্র পার্শ্বস্থ মৃতদেহ দেখাইয়া বলিল, "এই শ্মশান-বাসিনী" অগ্নিকুণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ অগ্নিকুণ্ডে শরৎ।"

সুরেন্দ্রের এই কথায় বিপ্রদাস চমকিয়া উঠিল। "শরৎ অগ্নিকুণ্ডে।" এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি অগ্নির নিকটে গিয়া দেখিল তখনও পা দুইখানি দগ্ধ বা বিবর্ণ হয় নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "শরতের দক্ষিণ পদে একটি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ছিল ইহার ত সেরূপ কিছু চিহ্ন নাই ? শরৎ ঈষৎ স্থূলকায় ইহার দেহ মাংসহীন—এ বালক, "শরৎ" এ কথা তোমাকে কে বলিল ?"

সুরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "শ্মশান-বাসিনী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছে সে শরৎকে জীবিতাবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

"শ্মশান-বাসিনী স্বয়ং শরৎকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে" সুরেন্দ্রের এই কথায় বিপ্রদাস আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি কাহাকে শ্মশান-বাসিনী বলিতেছ—এই মৃতরমণী?"

সুরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া চক্ষের জল মুছিল।

বিপ্রদাস পুনর্ব্বার বলিল, "সুরেন্দ্র! তুমি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছ। শ্মশান বাসিনীকে আমি অদ্য তিন দিন হইল এথান হইতে লইয়া গিয়া আশ্রমে রাখিয়াছি, ও রমণী শ্মশান-বাসিনী নহে—তবে শরতের অনুসন্ধান করিতে হইবে। তুমি যে দিন বাটি হইতে গিয়াছ সেই দিন এক বৃদ্ধা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে প্রথমতঃ শ্মশান-বাসিনীর নিকট তোমার ভগিনী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং শরৎকে তাহার বাটিতে লইয়া যাইবার প্রার্থনা করি। শ্মশান-বাসিনী তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তাহাকে বিষ প্রয়োগ দ্বারায় অচেতন করিয়া শরৎকে লইয়া যায়। সে লইয়া যাইবার ক্ষণকাল পরেই আমি আসিয়া দেখিলাম শ্মশান-বাসিনী অজ্ঞানাবস্থায় পতিত রহিয়াছে—প্রাণত্যাগ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল,—গুরুদেব পূর্ব্বে তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া যে মহৌষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার গুণ শরীরে অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকায় কোনও অনিষ্ট হয় নাই। আমি অনেক যত্নে তাহাকে সচেতন করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "তোমার কি হইয়াছে?" শ্মশান-বাসিনী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিল। আমি শরতের অনুসন্ধানে যাইবার মনস্থ করিলাম, কিন্তু তাহাকে একাকিনী

রাখিয়া যাওয়া অবিধেয় বিবেচনা করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলাম। যখন তাহাকে লইয়া তোমার বাটি হইতে বহির্গত হই, দুইটী কাঙ্গালিনী একটি শিশু সঙ্গে করিয়া লইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "ওগো! আমরা ভাগ্যবন্ত ঘরের স্ত্রী—এখন ভিখারিণী কাঙ্গালিনী। দুর্ভিক্ষে আমাদের স্বামী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। গৃহ দ্বার যাহা ছিল, তাহাও অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, আমাদের একটু দাঁড়াইবার স্থান নাই। যদি দয়া করিয়া তোমাদের বাটীতে আশ্রয় দাও তাহা হইলে দুই চারি দিন থাকিয়া আমাদের স্বামীর অন্বেষণ করি। আমি তাহাদিগকে তোমার বাটীতেই থাকিতে বলিয়াছিলাম। বোধ হয় এই রমণী ও অগ্নিমধ্যস্থ শিশু তাহারাই হইবে। শ্মশান-বাসিনীকে আশ্রমে রাখিয়া তোমার এবং শরতের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমাকে পাইলাম, এখন শরৎকে প্রাপ্ত হইলে নিশ্চিন্ত হই।

সুরেন্দ্র এবং বিপ্রদাসের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, কুকুরটী পূর্ব্ববৎ ব্যাকুল ভাবে কখনও সুরেন্দ্রের কখনও বিপ্রদাসের পদতলে আসিয়া পড়িতে লাগিল, কখনও বা দন্তের দ্বারায় তাহাদিগের বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বিপ্রদাসের এতক্ষণে সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। সুরেন্দ্রকে বলিল, "কুকুরটির কি একটি অভিপ্রায় আছে, মুখে ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই, বুঝাইবার জন্য কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।"

সুরেন্দ্র বলিল, "কুকুরটি শরতের। সে পাঠশালা যাইবার সময় উহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, লইয়া আসিত, সর্ব্বদা আহার দিত, এ জন্য তাহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে শরতের নিকট যাহা আহার পাইত তাহাতে পেট ভরিত

না, অন্য স্থানে আহার করিয়া আসিয়াও বাটীতে পড়িয়া থাকিত ও বোধ হয় শরৎকে কোথায় দেখিয়া আসিয়া থাকিবে—চল উহার অনুগমন করি।" বিপ্রদাস এবং সুরেন্দ্র কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

কুকুর ক্রমে ক্রমে চৈত্র খণ্ডে উপস্থিত হইয়া দ্রুতবেগে কমলার বাটীতে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া গভীর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্র এবং বিপ্রদাস তাহার ইঙ্গিতানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, বহুকালের একটী ভগ্নাবশিষ্ট গৃহ রহিয়াছে, প্রাঙ্গণ রহিয়াছে—প্রাঙ্গণে একটি তুলসীমঞ্চও রহিয়াছে। কুকুর সেই তুলসীমঞ্চের ভিত্তিস্থান নখরের দ্বারায় নিয়ত আঁচড়াইতে লাগিল, উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, ঠেলাঠেলি করিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। বিপ্রদাস তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া হস্তের দ্বারায় সজোরে টান দিল—মন্দির তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসিল। তখন দেখিল ভিতরে একটা বৃহৎ গহ্বর। সেই গহ্বরে নামিবার সিঁড়ি রহিয়াছে। উভয়ে তন্মধ্যে অবতরণ করিয়া দেখিল তাহা একটি গুপ্ত গৃহ।

পূর্ব্বকালে চোর দস্যুর ভয়ে অনেকানেক ধনবান ব্যক্তি মৃত্তিকার নিম্নে সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে অর্থাদি গোপন করিয়া রাখিত। তুলসীমঞ্চটি কেবল সিঁড়ির দ্বার গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যেই সেরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে তাহা স্থানান্তরিতও করা যাইত। সেই গৃহমধ্যে একটি দীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। ভূতলে একটি বালক অৰ্দ্ধ মৃতাবস্থায় শায়িত। তাহার চারি পার্শ্বে স্বর্ণমুদ্রা ও বহুমূল্য প্রস্তরে পরিপূর্ণ সাতটি কলস সজ্জিত। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যও তথায় রহিয়াছে।

ক্ষীণালোকে বালকটির অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বিপ্রদাস দীপটি খুব উজ্জ্বল করিয়া দিলে সুরেন্দ্র বালকটিকে শরৎ বলিয়া চিনিতে পারিল এবং কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দেখুন দেখুন এই বুঝি আমার শরৎ। কে মারিয়া এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছে।" বিপ্রদাস তাড়াতাড়ি গাত্র স্পর্শ করিয়া "ভয় নাই জীবিত আছে" বলিয়া ধীরে ধীরে ক্রোড়ে তুলিয়া উপরে উঠাইল এবং মুখে চোকে জল দিয়া বস্ত্রের দ্বারায় ব্যজন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিলে সুরেন্দ্র ডাকিল, "শরৎ।"

শরৎ তখনও কথা কহিতে পারিল না, কেবল একদৃষ্টে সুরেন্দের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া সুরেন্দ্র স্পষ্টই বুঝিতে পারিল সে অনেক কাঁদিয়াছে। তাহার চক্ষু হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত কর্জ্জল মিশ্রিত জলধারা গড়াইয়া কালিমা রেখা পড়িয়াছে। শরতের এতাদৃশ দুরাবস্থা দেখিয়া সুরেন্দ্র নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসিল, "শরৎ। তোমাকে এখানে কে আনিল?"

শরৎ আস্তে আস্তে বলিল, "পিসি!" পিসি বড় বজ্জাত, আমাকে এই ঘরে পুরিয়া কপাট দিয়া রাখিয়াছিল। আমি এত কাঁদিলাম খুলিয়া দিলনা—আমি আর পিসীর কাছে থাকিব না—আমাকে মার কাছে লইয়া চল, মার জন্য আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেন্দ্র শরতের অশ্রুপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ও সকরুণ আধ আধ বাক্য শুনিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিল। সস্নেহে পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন ও অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "আর কাঁদিও

না, এখনি তোমাকে বাটী লইয়া যাইব। সুরেন্দ্রের আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে শরতের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তখন কমলা যাহা যাহা করিয়াছিল, এক একটি করিয়া সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিল। শরতের কথায় তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, কোনও যাদুকরী তাহাকে যক দিয়াছে। কেবল প্রভুভক্ত কুকুরই তাহার জীবন দিয়াছে—অমূল্য রত্নোদ্ধার করিয়াছে। বিপ্রদাস এবং সুরেন্দ্র কমলার সমস্ত সম্পত্তি সহ শরৎকে সঙ্গে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইল। তথায় শ্মশান বাসিনী অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করিতেছিল, শরৎকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সীমা রহিল না।

সুরেন্দ্র কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান আসিল। বিপ্রদাস আশ্রমেই রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বর্দ্ধমানে দামোদরের তীর সন্নিকটে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। মাঝিরা খোঁটা পুতিয়া তথায় নৌকা বাঁধিল। উপর হইতে একজন সিঁড়ি

ফেলিয়া দিলে, দুইটী যুবতী কূলে উঠিল। মাঝি বলিল, "আমরা যাইনা ?"

যুবতীদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল, "আর তোমাদিগকে যাইতে হইবেনা, আমরা পথ চিনিয়া যাইতে পারিব।"

মাঝি আর কোনও উত্তর না করিয়া নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিল।

যুবতীদ্বয় রজনী এবং শতদল জঙ্গলের খেলা শেষ করিয়া—দস্যু গৃহ আঁধার করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার সতীত্ব হরণেচ্ছুক করিম খাঁ আর নাই—তাহার ফাঁসি হইয়াছে। গণিমিঞা রজনীর পিতার বন্ধু বলিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে। দস্যুগণ আজ রজনীকে ক্ষুণ্ণমনে বিদায় দিয়াছে। এতদিন তাহারা মার আদরের সন্তান হইয়া মারকোলে নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছিল, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছে। ভক্তগণ যেমন বিজয়া দশমীতে কাঁদিয়া উমা মাকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

মা দেশে যাইবেন, মার জন্য নৌকা সাজাইয়া দিয়াছে—বিবিধ বসন ভূষণ দিয়াছে—চারিজন সশস্ত্র রক্ষক দিয়াছে—আর দিয়াছে কি ? পুষ্প—সে বনপুষ্প নহে—তাহাদিগের মানস পুষ্প। যে "পুষ্পে তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বরীজ্ঞানে পূজা" করিত।

তাহারা রজনীকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিল। গৃহের দিকে চাহিয়া দেখিল, উদাস—মা নাই নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, অন্নাদি ফেলিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল। রজনীর গুণের কথা—স্নেহের কথা তাহারা অহর্নিশি ভাবিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ভাবিতেছ কেন ? চল মাকে আমরা

ফিরাইয়া আনি। না হয় সকলে মিলিয়া তাঁহার দেশে যাই ও সকল ধন অর্থ টাকা কড়ি সমস্তই কাঙ্গাল গরিবকে বিতরণ কর। অস্ত্র শস্ত্র জলে ফেলিয়া দাও। মিছামিছি আর শোক কর কেন? শোক করিলে কি আর মাকে পাইবে?—মা নিজের কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিলেন কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, আমাদের রোদন কেবল মনের ভুল। এখন যদি শান্তি চাও—তাঁহাকে ভুলিয়া যাও—হৃদয় পাষাণে বাঁধ।

অপর একজন বলিল, "যখন দস্যুবৃত্তি করিতে শিখিয়াছি তখন হৃদয়কে পাষাণেই বাঁধিয়াছি। পূর্ব্বে আমরা কত পাষণ্ডের কাজ করিয়াছি। মানুষ মারিয়াছি—গৃহে আগুণ দিয়াছি—ছোট ছোট ছেলে কাটিয়াছি—কি না করিয়াছি—তাহাতে আদৌ মন বিচলিত হয় নাই। এই প্রাণে কত ব্যথা সহিয়াছি—এওত সেই দেহ—সেই মন—সেই প্রাণ। চেষ্টা করিলে অবশ্যই মাকে ভুলিতে পারিব।

প্রথমোক্ত দস্যু বলিল, মাকি কাহারও সে মন—সে প্রাণ রাখিয়াছেন?—তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া এখন নূতন প্রাণ—নূতন মন গড়িয়া দিয়াছেন। সে মন থাকিলে কি দস্যুর চোকে ওরূপ জল গড়াইত?—"তুমি যদি বুঝিয়াছ তবে তাই কাঁদিতেছ কেন?"

দ্বি, দস্যু। কাঁদিতেছি—আর কাঁদিব না। মা যখন আমাদের সকলকে সরল মনে বিদায় দিতে বলিয়াছিলেন, আমরা সকলে সরল মনে বিদায় দিয়াছি। এখন শোকে বুক ফাটিয়া গেলেও যে শোক সহিতে হইবে। এখন প্রবল যাহা বলিল, তাহাই কর। টাকা কড়িগুলা তুলিয়া কাঙ্গাল গরিবকে সমস্ত বিলাইয়া দাও। আর অস্ত্র শস্ত্রগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পোষাক

ফোষাকগুলি ছিঁড়িয়া জলে দিয়া আইস—তবে ভুলিতে পারিবে। আর এ জঙ্গলও পরিত্যাগ কর—এখানে যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাকে মনে পড়িবে। ঐ দেখ তার ঘরগুলা যেন উদাস হইয়া রহিয়াছে।

দস্যুগণ সকলে এইরূপ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধনরাশি দীন দরিদ্রদিগকে সমস্ত বিতরণ করিল। অস্ত্রাদি যাহা ছিল সমস্ত চূর্ণ করিয়া নদীর অতল জলে নিক্ষেপ করিল এবং জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রজনীর বনের লীলা খেলা এতদিনে সাঙ্গ হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ-সম্মিলন।

রজনী এবং শতদল দামোদর তীর হইতে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান সহরে প্রবেশ করিল। পথে আসিতে আসিতে রজনীর একটু আশঙ্কা হইয়াছিল, মনে হইল যেন তাহার পশ্চাতে কেহ লোক আছে। পদশব্দ পাইয়া ফিরিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই, কখনও বা পার্শ্বে আবছায়ার ন্যায় দৃষ্ট হয়, চাহিয়া দেখে—কেহই নাই। শতদলকে কহিল, শতদল, একটু "ত্রান্ত যাই চল।" শতদল রজনীর অগ্রে অগ্রে আসিতেছিল, এ জন্য সে তাহা জানিতে পারে

নাই। ভয় পাইবে বলিয়া রজনীও তাহার নিকট ব্যক্ত করে নাই। বলিল, "ত্রাস্ত যাইব কেন?" রজনী বলিল, "রাত্রিকাল—জনশূন্য স্থান—বিপদ ঘটিতে বিলম্ব ক্ষণ নয়!"

শতদল একটু হাস্য করিয়া বলিল, "তোমার যে প্রাণে ভয় হইয়াছে—তবু ভাল!" রজনীর হস্তে একখানি নিষ্কোষিত অসি ছিল। অসিখানি বাহির করিয়া শতদলকে দেখাইয়া বলিল, "শতদল যতক্ষণ রজনীর দেহে জীবন—আর এই করে অসি আছে ততক্ষণ কাহাকেও ভয় করি না—ভয়ের মধ্যে পাছে আবার তোমার কার্য্যে কোনও বিঘ্ন হয়।"

শতদল জিজ্ঞাসিল, "তুমি যে আসিতে আসিতে বলিলে, জঙ্গলের খেলা ফুরাইল, এইবার সংসারের খেলাও শেষ করিব—সত্য সত্যই কি তুমি প্রাণত্যাগ করিবে?"

রজনী। বলিল, করিব—এখনও এক বৎসর বিলম্ব আছে,—শত্রু সংহার হইল এইবার একবার পতির অন্বেষণ করিব। শুনিয়াছি তিনি মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

শতদল বলিল, "তুমি ভাই বড় কঠিন, এ কথা শুনিয়া আজও নিশ্চিন্ত আছ!"

রজনী বলিল, "প্রতিজ্ঞা ছিল দুষ্টের দমন না করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না!"

শতদল বলিল, "যদি সাক্ষাৎ পাও তবে প্রাণত্যাগ করিবে কেন?"

রজনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তিনি কি আর আমাকে গ্রহণ করিবেন?"

শতদল বলিল, "কেন করিবেন না?"

রজনী বলিল, "এতদিন দেশ ছাড়িয়া দস্যুগৃহে রহিয়াছি

তাঁহার চিত্তে নিঃসন্দেহ হইবে না। তিনি পরিত্যাগ করিলে প্রাণত্যাগ ভিন্ন আর উপায় কি?"

শতদল। আমিও তোমার সঙ্গিনী হইব।

রজনী। অমন অমুঙ্গুলে কথা মুখে আনিও না—আগে সুমিলন হউক। শতদল কিছু বলিল না।

এবার রজনী একটু চমকিয়া বলিল, "শতদল! গহনার বাক্সটা আনিয়াছ?"

শতদল রহস্য করিয়া বলিল, "ঐ—যা! সেটা ভুলিয়া গিয়াছি।"

রজনী বলিল, "তবে ফিরিয়া যাই চল—কাল আবার আসিব।"

শতদল হাসিয়া বলিল, "না না, আনিয়াছি।"

রজনী বলিল, "যেই ফিরিবার নাম করিয়াছি অমনি মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—না?"

শতদল বলিল, "ফিরিলেই বা—ক্ষতি কি?"

রজনী হাসিয়া বলিল, "ও কথাটা আন্তরিক নয়। আর দুদিন পরে ক্ষেপিয়া যাইতে।"

শতদল বলিল, "তা বলিয়া তোমার মত ক্ষেপিয়া আত্ম-হত্যা করিতে সঙ্কল্প করি নাই।"

রজনী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "না—কেবল ডাকাতের মাঝ-খানে নিশুতি রাত্রে ঔষধ তুলিতে গিয়াছিলে। সেটা বুঝি ক্ষেপার কাজ নয়?"

উভয়ে এইরূপ কথা বার্ত্তায় সুরেন্দ্রের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল দ্বার খোলা রহিয়াছে।

অগ্রে রজনী বাটী প্রবেশ করিল—আবার সেইরূপ পদ-

শব্দ—কে যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এবার কাহাকেও কিছু বলিল না,—শতদলের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া একবারে গৃহের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল জানালার উপর একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। শরৎ ঘুমাইয়াছে—সুরেন্দ্র তাহার নিকট বসিয়া তামাক খাইতেছে আর গল্প করিতেছে—শ্মশান-বাসিনী হাস্যমুখে সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া অনন্যমনে শুনিতেছে, আর নিদ্রিত শরৎকে বাতাস করিতেছে।

রজনী হঠাৎ গিয়া সুরেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। শতদল গৃহের কপাটে দক্ষিণ বাহু সংলগ্ন করিয়া একটু ঘোমটা দিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রজনী দেখিয়া বলিল, "এসনা বহিন, খাতকের বাড়ী আসিতে এত লজ্জা কেন? তুমি যে আপনার ধনে আপনি চোর হইতে চাও।"

রজনীর বাক্যে শতদল সাহস করিয়া—মুখে হাসি টিপিয়া—তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল এবং এক একবার শ্মশান-বাসিনীর প্রতি অতীব কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। একটি যেন খুব ধীরে দীর্ঘনিশ্বাসও পরিত্যাগ করিল।

তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, "কে গা?"

রজনী উত্তর দিল, "মহাশয় এখন দিন পাইয়াছেন—চিনিতে পারিবেন না।" সুরেন্দ্র রজনীকে চিনিতে পারিয়া অতি ব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাদরে সম্ভাষণ করিল।

শ্মশান-বাসিনী তাড়াতাড়ি দুইখানি আসন বাহির করিয়া পাতিয়া দিল।

রজনী বলিল, "যখন চিনিতেই পারিলেন না তখন বসিয়া কি করিব?"

সুরেন্দ্র বলিল, "বসুন চিনিয়াছি।"

রজনী বলিল, "না মহাশয়, বসিবার সময় নাই—বসিলেই অনেক বিলম্ব হইবে—ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া আসিয়াছি। আমাদের পাওনা আমরা বুঝিয়া পাইলেই চলিয়া যাই।"

সুরেন্দ্র। যখন অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন তখন অবশ্যই পাইবেন—ব্যস্ত হইতেছেন কেন?

রজনী। মহাশয়! সাধে কি ব্যস্ত হইতে হয়—আপনার অনেক ধন আছে, লোকসান হইলে তত গায়ে লাগিবে না। আমার ভগিনীর যা ছিল, আপনাকে দিয়াই ফকির হইয়াছে, তামাদি হইয়া গেলে উহার আর হইবে না। কেমন কি না বলুন?

সুরেন্দ্র বলিল, "এই সামান্য বিষয়ের জন্য অবিশ্বাস করিতেছেন কেন?"

রজনী বলিল, "মহাশয়! আপনার পক্ষে সামান্য বিষয় বটে,—ভগিনীর তাহা যে অর্দ্ধেক অঙ্গ। অবিশ্বাস করিতে হয় আপনার চোয়ামী ব্যবহারে আমরা আপনার সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছি আপনি তাহার মত কোন কার্য্য করিয়াছেন? তিন দিনের মধ্যে পরিশোধ করিব বলিয়াছিলেন—দিন যে অতীত হইয়া গেল, কোথায় বা টাকা আর কোথায় বা মানুষ। বহিন কাঁদিয়া অস্থির,—ভাবিয়া আকুল। রাত্রিতে নিদ্রা নাই—কেবল আপনার ভাবনা ভাবে—আর আমাকে দিন রাত গঞ্জনা দেয়। আমি কত বুঝাই—যদি মেয়াদ গত হয় তোমার মানুষ আনিয়া দিব। ভদ্রলোকের বাড়ী চারি কড়া কড়ির তাগাদা করিতে যাওয়া যায় না। ভগিনী বলে, "কিসের ভদ্র!—যার জীবনের মূল্য

মাত্র চারি কড়া, তায় আবার হেয় রমণীর কাছে আবদ্ধ—আজিও পরিশোধ করিল না তাহাকে কি তুমি ভদ্র বলিতে চাও? কি বলিব, না বুঝিয়া হাতের ঢিল ছাড়িয়াছি—ফিরিবে না। যদিও ফিরাইবার হইত—ফিরিয়া লইতাম।" আমি জামিন হইয়া উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। না পারি আপনার কাছে জোর তাগাদা করিতে—না পারি উহাকে বুঝাইতে। এখন আপনাকে ওর হাতে সঁপে দিতে পারলেই আমি খালাস পাই—ভগিনীটিও বাঁচে।

রজনীর এই কথা শুনিয়া শতদল তাহার পৃষ্ঠে একটি কিল মারিয়া বলিল "তুমি নিপাত যাও।"

রজনী সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন মহাশয়! আমার ভগিনী চক্ষুলজ্জায় আপনাকে কিছু বলিতে পারিতেছে না—আমাকে বিরক্ত করিতেছে, শীঘ্র দিন, রাত্রি অনেক হইয়াছে! শতদলের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ত বোন ব্যবসা এখনও শিখ নাই—এক আধ দিন কারবার করিয়াছ, অত খাতির কেন? মুখের উপরে জোর তাগাদা কর—তবেত আদায় হইবে। শতদল বলিল, "আমার দায় পড়িয়াছে, তুমি জামিন আছ, আমি না পারিলে তুমি আদায় করিয়া লইবে।"

সুরেন্দ্রের দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল। রহস্যছলে বলিয়া ফেলিল, "কেন, আপনি আদায় করিতে পারিবেন না কেন? যখন মেয়াদ বহির্ভূত হউয়াছে, তখন আমিও আপনারই হইয়াছি।

সুরেন্দ্র বুঝিয়াছে ইহাতে কোনও বিশেষ রহস্য আছে, হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুরেন্দ্রের দেহ মন প্রাণ সমস্তই আপনার ভগিনীর হইল।"

রজনী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সুরেন্দ্রের হস্ত লইয়া শতদলের হস্তে দিয়া বলিল, "এই লও ভাই শতদল তোমার, তোমার বস্তু বুঝিয়া লও, আর আমাকে দোষী করিতে পারিবে না, তোমার কাছে সকল দায়ে মুক্ত হইলাম।"

শতদল বলিল, "আমার জিনিস আমি লইলে শ্মশান-বাসিনীর কি হইবে?"

রজনী। যদি মুখ চাও, তবে শ্মশান-বাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর।

শতদল শ্মশান-বাসিনীকে বলিল, শ্মশান-বাসিনী! তোমাকে এক্ষণে স্বামী পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটি মৃণালে কখনও দুটি শতদলের স্থান হইবে না।

এতক্ষণ শ্মশান-বাসিনী শতদলকে চিনিতে পারিল, পূর্ব্বে সুরেন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিল তিনি আর শতদলকে গ্রহণ করিবেন না। অদ্য তাহার পুনর্ব্বার আগমনে এবং তাহার সহিত সুরেন্দ্রের আলাপনে অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল "হয়ত আবার স্বামী স্বপত্নীকে—প্রণয়চক্ষে দেখিয়াছেন—স্বপত্নী হয় ত আবার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাহা না হইলে এত হাস্যালাপ কেন? "তোমাকে স্বামী পরিত্যাগ করিতে হইবে—একটি মৃণালে দুটি শতদল স্থান হইবে না" এ কথাই বা কি জন্য! স্বপত্নী স্বামীকে পাইবার জন্যই কি এ ছলনা করিয়া থাকিবে। স্বামী যদি শতদলকে আবার ভালবাসিয়া থাকেন তবে তাহাতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইব না; তাহাতে আবার স্বামীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে—স্বপত্নীর চির আশা ভঙ্গ হইবে" এই ভাবিয়া বলিল, দিদি! তুমি নিজের পতি নিজে লইবে তাহার জন্য এত আর ছলনা কেন? এই তোমার স্বামী তুমি গ্রহণ কর—অক্ষুণ্ণ মনে আমি পরিত্যাগ করিলাম।

শতদল বলিল, এখনও ভাল করিয়া বুঝ, শেষে যেন অন্তরে কাতর হইও না।”

শ্মশান। দিদি তুমি এ কথা বুঝিও, শ্মশান-বাসিনী নিজের স্বার্থ কিছু মাত্র চাহে না—সরল মনে পতিকে তোমার পবিত্র করে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। তোমার মত সাধ্বী সতীর করে পতি অর্পণ করিয়া চিরদিনের মত সুখী হইতে পারিব।

শতদল। কোথায় যাইবে?

শ্মশান। আবার মহাশ্মশানে চির শয়ন করিয়া শ্মশান-বাসিনী নাম সার্থক করিব। যেখানকার শ্মশান-বাসিনী সেখানে যাইবে।

শতদল। ভাল কথা, তবে জন্মের মত এই সকল অলঙ্কার গুলি একবার তুমি পরিয়া লও। এই বলিয়া সত্বর বাক্স খুলিয়া শ্মশান-বাসিনীকে অলঙ্কারগুলি পরাইতে চেষ্টা করিল।

শ্মশান-বাসিনী বলিল, “দিদি! ও সব কেন, স্বামীই রমণীর এক মাত্র—যখন সে স্বামী চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম তখন ক্ষণকালের জন্য এ তুচ্ছ অলঙ্কার পরিয়া কি হইবে?”

শতদল বলিল, “আমার সাধ।”

শ্মশান। তবে তাহা পূর্ণ কর।

শতদল শ্মশান-বাসিনীকে মনের সাধে সেই অলঙ্কারগুলি পরাইয়া সুরেন্দ্রের বামপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দিল।

এতক্ষণ সুরেন্দ্র অবাক হইয়া কি ভাবিতেছিল, “এ আবার কি! তবে কি ইহারা প্রকৃত দস্যুকন্যা নয়?” এই যুবতীই কি আমার সেই শতদল? এ সকল কৌশল কি সুধু আমার জন্যই? শতদল আমার কি এতদূর বুদ্ধিমতী! আমি এমন বুদ্ধিমতী গুণ-

যতী স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করিয়াছি, আমার জীবনে শত সহস্র ধিক, ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া শতদলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল, "শতদল! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার অতি নির্ম্মম পাষাণ পতি—তোমার ন্যায় গুণবতী স্ত্রীকে অনন্ত কষ্ট দিয়াছি। তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহিয়াছ সে সকল আর কিছু মনে করিও না। তুমি সাধ্বী—গুণবতী। দুঃখে তোমার চক্ষে যত জল পড়িয়াছে আমি তত কষ্ট ভোগ করিয়াছি। শতদল!—আমার দুঃখের শেষ নাই—সে কথা তোমাকে কত বলিব। তোমার অসামান্য বুদ্ধিবল আমাকে কিনিয়াছে, আজ হইতে চিরদিনের জন্য তোমার নিকটে চির বিক্রীত হইয়া রহিলাম। আমি অভিমানে তোমাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম; আবার হৃদয় পাতিয়া দিতেছি—হৃদয়ের স্বর্ণপ্রতিমা একবার হৃদয়ে এস। যত দিন বাঁচিব তোমার কেনা হইয়া থাকিব। আমি তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আইস শতদল! তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী" এই কথা বলিয়া শতদলকে সাদরে হৃদয়ে টানিয়া লইল। শতদলের মুখমণ্ডল আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হইতে-ছিল—সুরেন্দ্র তাহা স্বহস্তে মোচন করিয়া দিল।

শতদল বলিল, "আমি গৃহে থাকিলে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।" তুমি যে একটীবার বলিয়াছ শতদল তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তাহাতেই আমার সকল দুঃখে অবসান হইয়াছে—সকল সাধ মিটিয়াছে। আর শ্মশান-বাসিনীর কণ্টক হইব না, স্ত্রী হইয়া তোমাকেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে ডুবাইব না।

সুরেন্দ্র কাতরভাবে বলিল, শতদল! আর কেন লজ্জা দাও? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হউক—না হয় নরকে যাইব, তোমাকে গ্রহণ করিলাম।

রজনী "যা হয় কর ভাই" বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রাঙ্গণে আসিয়াছে, আরায় সেইরূপ পদশব্দ। রজনী বিবেচনা করিল পাপিষ্ঠ গণিমিঞাকে ছাড়িয়া দিয়াছি বোধ হয় পুনর্ব্বার সে আমাকে ধরিবার জন্য অনুসরণ করিয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া আত্ম রক্ষা করিবার জন্য যেমন অসি উত্তোলন করিল, অমনি কে একজন পশ্চাৎ হইতে অসির সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া ফেলিল। রজনী চাহিয়া দেখিল বিপ্রদাস— আসিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

বিপ্রদাস বলিল, "ইন্দুমতি! ধন্য তোমার অধ্যবসায়! ধন্য তোমার অতুলনীয় পতিভক্তি!—বহুদিন তোমার অনুসন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু সাক্ষাৎ করি নাই। পাপ মন তোমার প্রতি যে সন্দেহ করিয়াছিল এতদিনে সে সন্দেহ একেবারে দূর হইল।"

রজনী বহুদিন পরে পতি সন্দর্শন লাভ করিয়া অবিরলধারে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। বিপ্রদাসের হস্ত ধরিয়া বলিল "পাটনা হইতে কবে আসিলেন?"

বিপ্রদাস বলিল, "যে দিন তুমি পাপীষ্ঠদিগকে প্রতারণা করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলে।"

"ইন্দুমতি, পাটনা" এই দুটি কথা শুনিয়া শ্মশান-বাসিনীর পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণ হইল। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, "দিদি তুমি এখানে?" বলিয়া ইন্দুমতীর সম্মুখে দাঁড়াইল, ইন্দুমতী প্রথমতঃ শ্মশান-বাসিনীকে জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া চিনিতে পারিল না, জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে?"

শ্মশান-বাসিনী পাপীষ্ঠ করিম খার ভয়ে পলায়নের পর যেরূপে শ্মশানে প্রাণত্যাগ সন্ন্যাসী তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং

বর্ণন করিল। মৃতা ভগিনীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রজনী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। আহ্লাদে তাহার গলদেশে বাহুলতা স্থাপনপূর্ব্বক অনেকক্ষণ নিঃশব্দে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিল।

আজ সুরেন্দ্রের বাটীতে অপূর্ব্ব মিলন হইয়া গেল। কাহারও আনন্দের সীমা রহিল না। ইন্দুমতী এবং মহীপাল সিংহ কয়েকদিন সুরেন্দ্রের বাটীতে অবস্থান করিয়া পাটনা যাত্রা করিল।

সহৃদয় পাঠক মহাশয়! এই স্থানে উপন্যাস সমাপ্ত করিলাম—ভিক্ষা করি, শ্মশান বাসিনীকে আপনারা স্নেহ মসৃণ চক্ষে অবলোকন করিবেন।

সমাপ্ত।